আনন্দমেলা
২০মে১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশ •
১.৫০

"বালী বালী, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

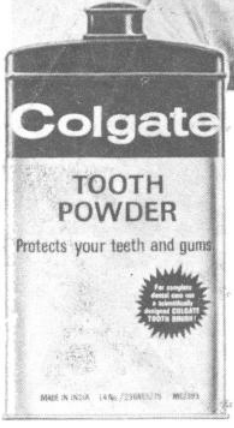

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণু-গুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

আনন্দমেলা

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮ • ২০ মে ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ৩ সংখ্যা

গল্প

খাই-খাই। অশেষ চট্টোপাধ্যায় ১০
কাকের বিচার। অজেয় রায় ২১
পুজোর চাঁদা। সমীর সেনগুপ্ত ৫৬

উপন্যাস

সিসের আন্ডটি। বিমল কর ১৭
হারানো কাকাতুয়া। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৯

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২৪

ছড়া

বানানের ছড়া। দেব সেনাপতি ২৭

বিশেষ রচনা

খনি থেকে খনিজ। দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৪

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল। পি কে ৫৩

চিত্রকাহিনী ও কমিকস

সদাশিব ২৮ রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

টাকী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৫৮
ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৫৯
বাংলা বলো। বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি। প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

কিং রাজা, প্রকাশ মন্ত্রী। অলোক দাশগুপ্ত ৪২
অশোক মাঁকড়ের ম্যাচ। অভিমন্যু ৪৪
কী করে নাগজি ট্রফি পেলাম। সুরজিৎ সেনগুপ্ত ৪৭

অন্যান্য আকর্ষণ

ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪ তোমাদের পাতা ৩৭
ছবির মজা ৪৮, আঁকো-শেখো ৬৬

লিয়েম সুই কিংয়ের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

প্রচ্ছদ : তপন দাশ

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং দেশ পাবলিকেশন্স (প্রা) লিমিটেড, ২৬৭ রয়াপেটা হাই রোড, মাদরাজ ৬০০ ০১৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমূল্য মাশুল ঃ ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

CHAITRA-G-137 BEN

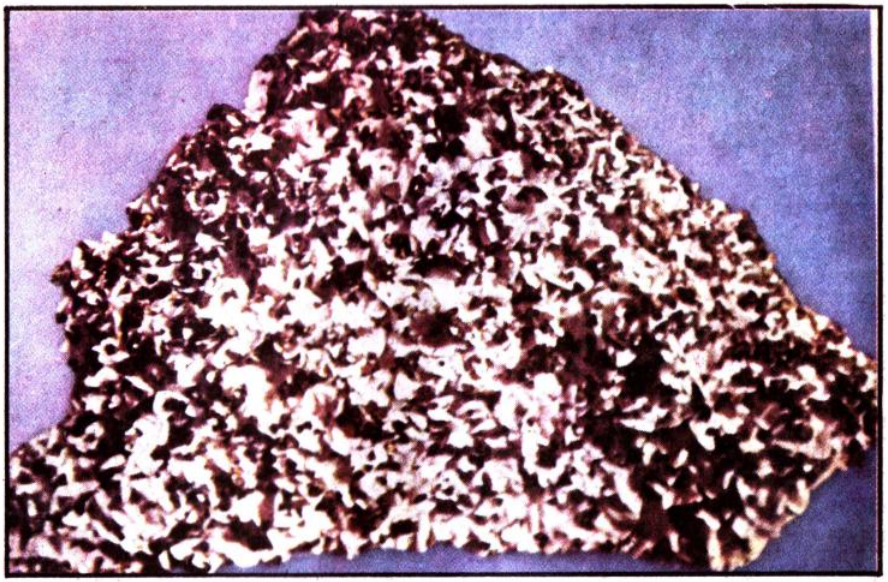

মিসৌরিতে-পাওয়া ডলোমাইট

খনি থেকে খনিজ

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

খনির কথা বললে প্রথমেই মনে পড়ে কালো কুচ্ছিত কয়লাখনির কথা। তাই না! মাটির ওপর থেকে নীচে খাড়া গভীর কী বিচ্ছিরি লম্বা সুড়ঙ্গ, তার মধ্যে ওঠা-নামার জন্য চৌকো খাঁচার মতো একটা উল্ভট লিফ্‌ট। লিফ্‌টে চেপে বাইরের আলো ছেড়ে হঠাৎ নীচের অন্ধকারে নামলে বুকের ভেতরটা ঢিব-ঢিব করতে থাকে অজানা আতঙ্কে। মনে হয়, যেন পৃথিবীর শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। সে যাই হোক না কেন, এই খনি থেকেই তো তুলে আনতে হয় কয়লা। আদর করে কেউ কেউ আবার ডাকে কালো মানিক। আজকের দিনে কয়লা যে আমাদের কত কাজে লাগে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরি করতে জ্বালানি চাই কয়লা। বিদ্যুৎ ছাড়া যে আমাদের

আমাজোনাইটের অলঙ্কার

একটা দিনও চলে না, তা কি আর বুঝতে বাকি আছে। লোহার আকরিক থেকে লোহা বের করতে হবে? তাতেও লাগবে কয়লা। তাছাড়া ঘরের উনুন জ্বালতে কিংবা রান্নার গ্যাস তৈরির কাজেও কয়লা।

খনি থেকে পাওয়া যায় বলে কয়লাকে বলা হয় খনিজ অর্থাৎ খনিজাত। খনিজ পেতে যে সবসময় খনি থেকে খনন করতেই হবে, এমন কোন মাথার দিব্যি নেই। তবে কখনো কখনো খনি নয়, ভূপৃষ্ঠের পাথর থেকেই সরাসরি খনিজ পাওয়া যাচ্ছে। নানারকম খনিজ মিলে তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে তৈরি হয়েছে পাথর। তোমরা যারা পাহাড়ে জঙ্গলে বেড়াতে গেছ, তারা নিশ্চয়ই খুব চুটিয়ে পাথর-টাথর দেখেছ। কালো, সাদা, লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি—কত বিচিত্র রঙেরই না পাথর পাওয়া যায় প্রকৃতিতে। আর তাই যে খনিজ দিয়ে তৈরি হয়েছে, তারও তো রূপ-বৈচিত্র্যের সীমা-পরিসীমা নেই। প্রকৃতি তার সব রূপ-রস-বর্ণটুকু যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে খনিজের রূপলাবণ্য সৃষ্টির প্রয়োজনে।

কোন্ খনিজ ছেড়ে কোন্ খনিজের কথা বলব? প্রথমে তাহলে বলি পৃথিবীর সেই আদিযুগের কথা। তাম্রযুগের খনিজের কথা। আজ থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষ নিজের প্রয়োজনে তৈরি করেছিল পাথরের অস্ত্রশস্ত্র। শিকারের প্রয়োজনে, মাংস কাটবার জন্য, গাছ কাটবার দরকারে। সেই প্রস্তরযুগের পরে এল ব্রোঞ্জ বা তামার যুগ। চার-পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু নদের উপত্যকায় মহেনজোদড়ো ও হরপ্পার যুগেই মানুষ শিখেছিল ধাতুসমৃদ্ধ পাথর বা আকরিক থেকে কী কায়দায় ধাতু নিষ্কাশন করতে হয়, আর সেই ধাতুকে কী করে মানুষের নানা প্রয়োজনে লাগানো সম্ভব। মহেনজোদড়োতে পাওয়া সোনা, রুপো ও তামার অলংকার, বিশেষত তামা ও ব্রোঞ্জের নানা অস্ত্র বা যন্ত্রপাতি দেখে সেই প্রাচীন সুসভ্য মানুষদের সম্পর্কে সত্যিই শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে।

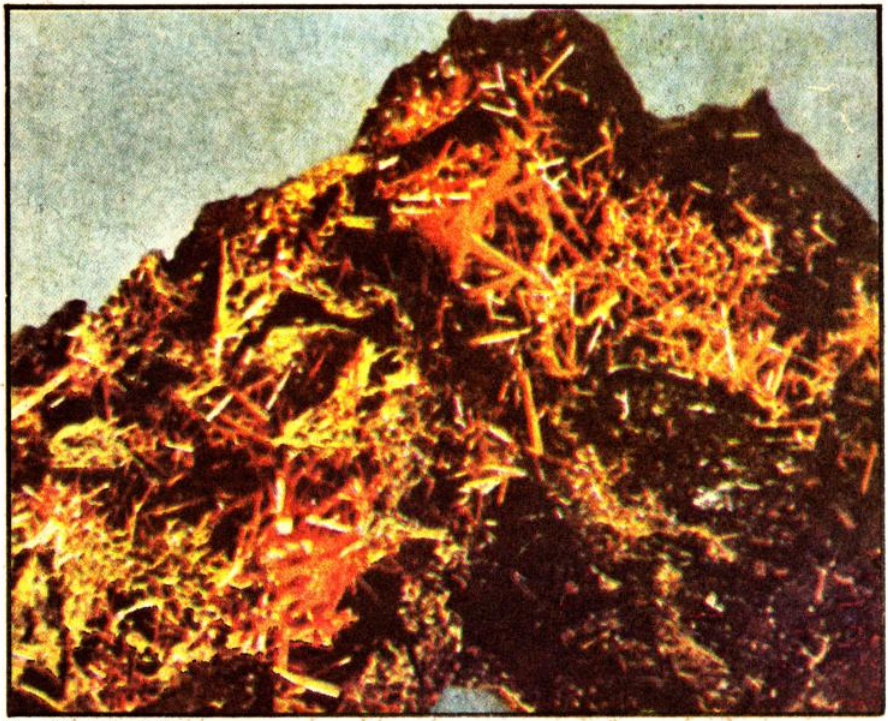

টাসমানিয়ার লিমোনাইট

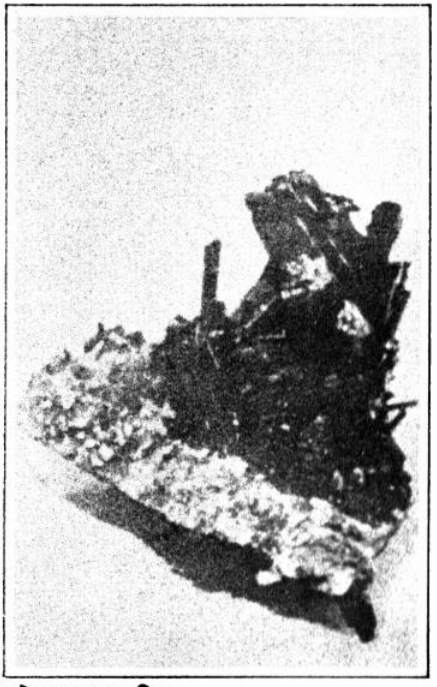

আস্ট্রিয়ায়-পাওয়া স্ফটিক

তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পেতল, আর তামার সঙ্গে টিন ও দস্তা মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল সে-যুগেরই মানুষ। তামার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য খনিজের নাম চালকোপাইরাইট, যা থেকে নিষ্কাশিত হয় তামা। এর রঙ অনেকটা জংলি ক্যাকটাস ফুলের মতো হলদে, যদিও মাঝে মাঝে সোনার মতো ঝকঝক করে, তবে সোনার চেয়ে অনেক হালকা এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে গলে যায় মোমের মতো। তাছাড়া তামা, লোহা আর গন্ধক মিলিয়ে তৈরি এই আকরিকে হাওয়া, রোদ, বৃষ্টিতে মরচে ধরে সহজেই। আর এভাবেই তৈরি হয় দ্বিতীয় প্রজন্মের সবুজাভ ম্যালাকাইট, যার রঙের সঙ্গে হয়তো তুলনা চলে সবুজ পান্নার। পুরনো পুঁথি থেকে জানা যায়, প্রাচীন মিশরের সুন্দরীরা তাদের চোখ রাঙিয়ে তুলতেন সবুজ ম্যালাকাইটের অঞ্জনে। ভারতে তামার আকরিক পাওয়া যায় বিহারের ঘাটশিলা (রাখা) অঞ্চলে, রাজস্থানের ক্ষেত্রী, অন্ধ্রপ্রদেশের অগ্নিগুনডলা ও মধ্যপ্রদেশের মালঞ্চখণ্ডে।

বুঝতে পারছি, খনিজের কথা শুনতে শুনতে তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, খনিজের সঙ্গে পাথরের গলায় গলায় বন্ধুত্বের কথা তো শুনলাম, কিন্তু খনিজের আসল চেহারাটা কেমন, আর সেটা থাকেই বা কী করে পাথরের শরীরে তা তো জানা হল না। বেশ। এবার তবে তোমাদের প্রশ্নের জবাবে বলি, খনিজের জন্ম আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ম্যাগমা থেকে, স্ফটিকের আকারে। সব মানুষের চেহারা যেমন একরকম নয়, তেমনি সব স্ফটিকের চেহারাও একরকম নয়। স্ফটিকের চেহারা কখনো চৌকো বাক্স বা মিশরের পিরামিডের মতো, আবার কখনো বা ধারালো ছুরির মতো কিংবা নানা জ্যামিতিক প্যাটার্নের। আর শরীরের রঙ! জলের মতো স্বচ্ছ স্ফটিক যখন আবিরের মতো লাল, আকাশের মতো নীল কিংবা গাছের পাতার মতো সবুজ, তখন তার রূপের স্পর্শ পেতে পারে কেবল কবির কল্পনা। সব স্ফটিকই অবশ্য অপরূপ হয় না। প্রকৃতির খামখেয়ালিতে চাপ ও তাপের মধ্যে ভারসাম্যের অভাবে স্ফটিকের গড়নে প্রায়ই নানা ত্রুটি, বিকৃতি থেকে যায়। তবু সেই

স্ফটিক, নাকি সাদা ফুল?

কুরূপ খনিজ নির্গুণ নয়। সাধারণ স্ফটিকের আকার যেখানে লুডোর ছক্কা থেকে প্রমাণ সাইজের ইঁট, সেখানে কখনো-কখনো তার অবয়ব হতে পারে গ্রীক বীর হারকিউলিসের প্রতিপক্ষ। এক বিরাটদেহী ফেল্ডস্পার স্ফটিকের দেখা মিলেছে রাশিয়ার ইউরাল পাহাড়ে। শুনলে অবাক হবে, এই একটি স্ফটিকের ভেতরেই খনন করা হয়েছে ছোটখাট একটি খনি। ব্রাজিলের আর একটি খনিতে পেগমাটাইট নামের এক পাথরের ভেতরে পাওয়া গেছে পাঁচ টন (প্রায় ১৩৫ মন) ওজনের বিরাট দৈত্যের মতো এক কোয়ার্টজ স্ফটিক। এর তুলনায় অন্য স্ফটিকেরা তো নেহাতই লিলিপুট। কানাডার অনটারিয়োতে একটি অভ্রের স্ফটিক পাওয়া গেছে, যার শরীরের ওজন নিদেনপক্ষে ৯০ টন আর স্ফটিকের ব্যাস ১৪ ফুট। তবে এসবই ব্যতিক্রম। প্রকৃতির নিছক খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। কে বলে ছোটরাই খালি খামখেয়ালি হয়, দুষ্টুমি আর খামখেয়ালিপনাতে প্রকৃতিও কিছু কম যায় না।

হীরা আর মাণিক্য বা মানিক—এ দুটি

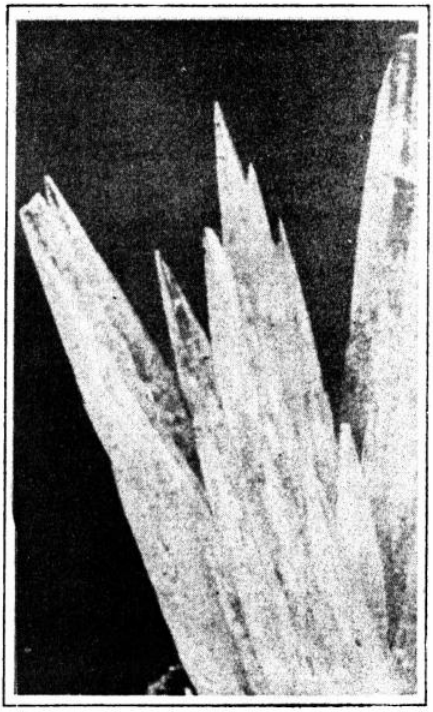

স্ফটিক, নাকি পাতাবাহার?

খনিজ আর ধবধবে সাদা মুক্তার জন্ম সমুদ্রের নীচে ঝিনুকের মধ্যে। হীরা আর মানিক—এ দুটি হল মণিপাথর। অর্থাৎ এই দামী স্ফটিকগুলো ব্যবহৃত হয় জড়োয়া গয়না বা আংটির সঙ্গে। শুধু বর্তমান কালে নয়, রামায়ণ, মহাভারতের সময় থেকেই ভারতে মণিরত্ন ব্যবহৃত হয়ে আসছে ঐশ্বর্য, মর্যাদা আর বীরত্বের প্রতীক হিসেবে। প্রাচীন ভারতে যেসব মণিরত্নের কদর ছিল, তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় হীরা, মানিক বা চুনি, নীলকান্তমণি বা নীলা ও মরকত বা পান্নার কথা। রোমান লেখক প্লিনি বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি মণিপাথর পাওয়া যায় ভারতে। হীরা এত বেশি উজ্জ্বল ও দ্যুতিময়, কিন্তু এর রাসায়নিক উপাদান এমন কিছু আহামরি নয়, নিতান্তই সাধারণ কারবন, যা দিয়ে তৈরি হয়েছে কালো কয়লা।

হীরা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ভারতে এবং তার বহু পরে ব্রাজিলে ১৭২৫ সালে এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ১৮৬৭ সালে। প্রকৃতির

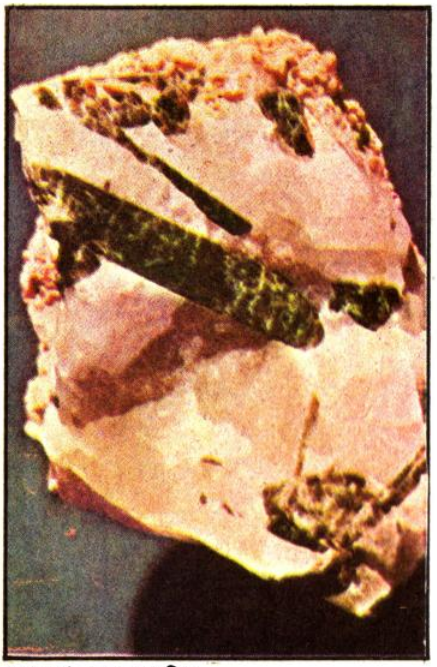

পাথরে-গাঁথা সবুজ স্ফটিক

মরক্কোর স্ফটিক

পাথরে-গাঁথা সাদা ও হলুদ স্ফটিক

বুকে যে অকৃত্রিম বিশুদ্ধ হীরা পাওয়া যায়, তা কিন্তু প্রথম দর্শনে খুবই সাদামাটা। পরে তাকে সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষের রূপরুচির সঙ্গে মিলিয়ে কাটলে হীরার হৃদয় চিরে বেরিয়ে আসে তার অপরূপ দ্যুতি—নীল, সবুজ, হলুদ, লাল, ধূসর ইত্যাদি নানা রঙের অপূর্ব মনোরম এক মায়াজাল। হীরার আলো বিচ্ছুরণের ক্ষমতা প্রচুর, তাই না হীরার চমক এত চোখ-ধাঁধানো।

হীরার ব্যবহার দু'ভাবে। প্রথমত স্বচ্ছ দ্যুতিময় হীরার কদর মণিপাথর হিসেবে। দ্বিতীয়ত, অস্বচ্ছ দাগওলা হীরা নানা ধরনের শিল্পের প্রয়োজনে। শক্ত যে-কোন জিনিস, তা সে হীরা বা শক্ত ইস্পাতই হোক না কেন, কাটতে লাগে হীরা বা হীরা-লাগানো যন্ত্রপাতি। অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলা ও মধ্যপ্রদেশের পান্নায় পাওয়া যায় ভাল জাতের হীরা।

স্বচ্ছ লাল রঙের কোরানডাম হল চুনি আর নীল রঙের কোরানডামের নাম নীলা। নীলা আর চুনি পাওয়া গেছে জম্মুর ফিসটাওয়ার জেলার বিখ্যাত সুমজাম খাঁন থেকে।

পীত-বাদামি স্ফটিক

কাশ্মীরের এই নীলার খনি প্রায় পনেরো হাজার ফুট উঁচু। প্রায় সারা বছর ঢাকা থাকে বরফে। বছরে শুধু তিনমাস—জুলাই থেকে সেপটেম্বর পর্যন্ত খনিতে কাজ হয়। ১৮৮৭ সালে এই খনিতে পাওয়া গিয়েছিল একটি বড় আকারের নীলার স্ফটিক যার ওজন ৯৩০ ক্যারাটের মতো।

শুধু কয়লা, তামার আকরিক, অভ্র কিংবা হীরা-মানিক নয়, খনি থেকে পাওয়া যায় অজস্র খনিজ যা আমাদের প্রতিদিনের নানা বায়না মেটাচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে ট্রানজিসটরের ভেতরে কর্মব্যস্ত ছোট্ট খনিজটিকে, এরোপ্লেন কিংবা রেলইনজিনের শরীরের উৎস আকরিক খনিজের কথা। নব-বধূর হাতের আংটির মণিপাথর, চীনামাটির মিশেলে তৈরি দাঁত মাজবার টুথপেস্ট কিংবা পৃথিবীর নরমতম খনিজ ট্যাল্‌ক যা থেকে তৈরি হচ্ছে ট্যালকাম পাউডার, এসবই আমাদের প্রকৃতির অকৃপণ দান। এভাবেই খনিজসম্পদ আমাদের জীবনকে উন্নততর করে তুলতে সাহায্য করছে।

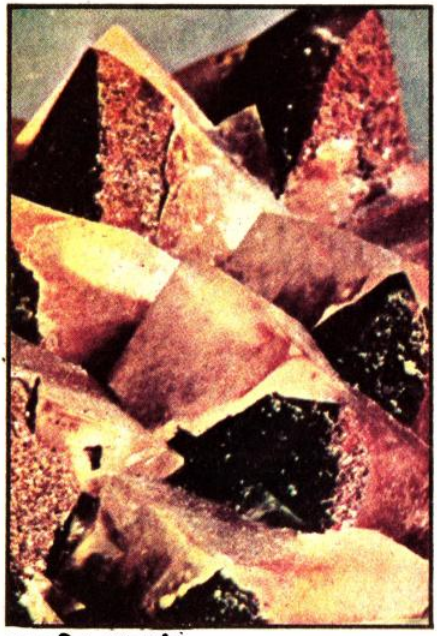

এও স্ফটিক, পাথরে-গাঁথা

খাই-খাই

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

"আধমনি কৈলাসের নাম শুনেছ? মুনকে রঘু?" জিজ্ঞাসা করলেন চক্রবর্তী মশাই।

এক-এক জন লোক জীবনে এক-একটা ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত। চক্রবর্তী মশাই জীবনের প্রথম পঞ্চান্নটা বছর খাবার জিনিসের সঙ্গে ডাকটিকিট-সাঁটা। ছাপান্নতে হৃদ্‌যন্ত্রে একটা সাংঘাতিক ঝাঁকুনি। এখন পছন্দসই খাবার সামনে ধরলেও তাঁর নজর ওপর দিকে। নেমন্তন্ন রাখতে আসেন ভদ্রতার খাতিরে। খাবার জন্যে অনুরোধ করলেই হাতজোড়। তবে আগেকার আমলের ভোজনবীরদের গল্প বেশ ভাল বলতে পারেন।

উপলক্ষ কুঞ্জ উকিলের মায়ের শ্রাদ্ধ। আজ নিয়মভঙ্গের খাওয়া। শেষ ব্যাচ উঠল বেলা চারটেয়। চক্রবর্তী মশাইকে মাঝখানে রেখে নানান বয়েসিদের আড্ডা। সাদা কাপড় দিয়ে ঘেরা প্যাণ্ডালের এক কোণে। প্রশ্নটা শুনে সবাই খানিক চুপচাপ।

"আচ্ছা চক্রবর্তী মশাই," মুখ খুলল ছোকরা উকিল ফণী মিত্তির, "সত্যি সত্যি কি এক মন কি আধ মন খাবার জিনিস এই আপনার রঘু কি কৈলাস খেতে পারত?"

চক্রবর্তী মশাইয়ের গলার মধ্যে কুটকুট। বলতে ইচ্ছে হল, তোমার কাজ তো লোককে মিথ্যে কথা বলতে শেখানো। তার বাইরে দেখা মানেই তোমার কাছে অন্ধের হস্তী-দর্শন।

"ওঁরা সব মহাপুরুষ," অগত্যা শক্ত কথাগুলোর পাশ কাটিয়ে বললেন, "ওঁরা সমুদ্র হলে ওঁদের কাছে আমি কলসির জল। তবু এই শর্মাই রামজয় মুখুজ্যের মেয়ের বিয়েতে ছাপ্পান্নখানা রুই মাছের দাগা খাবার পর তিরিশটা কড়াপাকের রসগোল্লা চড়িয়েছিল।"

"হ্যাঁ, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই," বলল হারাধন কর। বাজারে বড় হার্ডওয়ারের দোকানের মালিক। চুল, ভুরু, ঝোল্লা গোঁফ, সব কাঁচাপাকায় মেশানো। খাবার লোভ আছে বেশ। আবার লোভের যমজ ভাই হিসেবে পেটের গণ্ডগোলের ভয়ও আছে। আজ খেতে বসে তিনবার মাছ, দুবার মাংস আর দুবার দই নিয়েছে। আর তারপর শেষ পাতে বাঁ হাতে কী সব বড়ি আর ক্যাপসুল পকেট থেকে বের করে জল দিয়ে গিলল।

বিষ্ণু বিশ্বাস কনট্রাকটর। দেদার কাঁচা পয়সা। জেলা পুলিসের বছরের পিকনিকে বিনা পয়সায় পাঁঠা সাপ্লাই করে। সে বলল, "খেতে পারে বটে এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের সেই সাব-ইনস্পেক্টর, কমল ভটচাজ। থালাটালা লাগে না, একেবারে

সোজাসুজি হাঁড়ি থেকে খায়।"

"মোল্লার দৌড় মসজিদ আর তোমার দৌড় ওই কমল ভট চাজ পর্যন্ত," বেশ ঝাঁঝালো গলায় বললেন চক্রবর্তী মশাই, "বলি মালদার মিশ্রভাইদের খাওয়া দেখেছ? দেখলে তোমার কমল ভট চাজ এক হাতের বদলে দু হাতে সেলাম ঠুকে চলে যেত।"

"তাঁরাও আপনার রঘু আর আধমনি-কৈলাসের সমান নাকি?" খোঁচা মেরে জিজ্ঞাসা করল বিষ্ণু বিশ্বাস।

"না," বেশ সিরিয়াস গলায় বললেন চক্রবর্তী মশাই, "তবে আমার ধারণা তাঁরাই ভাগাভাগি করে মিশ্রদের তিন ভাইয়ের মধ্যে পুনর্জন্মলাভ করেছিলেন। ভাবতে পারো মিশ্রদের তিন ভাইয়ের খাবার দাপটে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের নামী দামি রেস্তোরাঁ 'রাঁদেভু' উঠে গেল," সাস্‌পেনসের সলতেটা উশকে দিয়ে চক্রবর্তী মশাই মাঝরাস্তায় থেমে গেলেন।

"সে তো শুনেছি পার্টনারদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল বলে," ধাঁ করে বলল বিষ্ণু বিশ্বাস।

"ছাই জানো তুমি," গোঁজ হয়ে বললেন চক্রবর্তী মশাই।

বিষ্ণু বিশ্বাস আবার কী বলতে যাচ্ছিল। হাত তুলল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সিতাংশু মজুমদার। বলল, "বিষ্ণুবাবু, প্লীজ, চক্রবর্তী মশাইকে একটু বলতে দিন।" তারপর বিষ্ণু বিশ্বাসের থমকানো মুখকে আমল না দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এবারে বলুন চক্রবর্তী মশাই আপনার এই কলিযুগের ভীমদের গল্প।"

"গল্প নয়," চক্রবর্তী মশাইয়ের গলা একদম ভরাট, "কোর্ট ফি দেওয়া কাগজে সই করে আদালতে হলফ নিয়ে বলতে পারি—যাহা বলিব সত্য বলিব, মিথ্যাকে সত্যের ন্যায় সাজাইয়া বলিব না।"

সকলের কাছে থাবা খেয়ে বিষ্ণু বিশ্বাসের মেজাজটা চড়ে যাচ্ছিল। সেও হেসে ফেলল চক্রবর্তী মশাইয়ের কথা বলার ঢংয়ে।

"হ্যাঁ, মন দিয়ে শোনো," চক্রবর্তী মশাই হঠাৎ সুর করে বললেন, "মিশ্র-ভ্রাতাদের কথা অমৃতসমান, দ্বিজ চক্রবর্তী কহে শোনে পুণ্যবান।"

শুরু হল চক্রবর্তী মশাইয়ের কথকতা :

কথায় বলে মর্নিং শোজ দা ডে। মিশ্রদের বড় ভাই মাত্র চার বছর বয়েসে খাটের নীচে রাখা আড়াই সেরি দইয়ের হাঁড়ি সাফ করে দিয়েছিল। তিন ভাইয়ের বয়েসের টোটাল যখন বাইশ, একটা মুলতানি গরু, দু বেলায় বারো সের দুধ দিত, তিন জনে মিলে সেই দুধ স্বচ্ছন্দে মেরে দিত।

"মাপ করবেন," আচমকা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সিতাংশু মজুমদারের কথায় চক্রবর্তী মশাইয়ের ভুরুতে জট পাকিয়ে গেল। তাই দেখে তড়িঘড়ি বলে ফেলল সিতাংশু, "কিন্তু এই বিপুল খাদ্যবস্তুর জোগান আসত কোথা থেকে? জমিদার ছিলেন নাকি আপনার মিশ্ররা?"

"বলা বাহুল্য," ভুরু দুটোর জট ছাড়িয়ে অবহেলায় বললেন চক্রবর্তী মশাই,"ওরা আসলে মৈথিলী ব্রাহ্মণ। তবে অনেক পুরুষ ধরে মালদায় থেকে পুরোপুরি বাঙালি হয়ে গেছে। মালদা জেলায় ও রকম মিশ্র আর ঝা পদবীওয়ালা

সুপার রিন-এর শুভ্রতার অধিক চমক

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট বা বারের চেয়ে অনেক বেশী !

সুপার রিন-এর নিয়মিত ব্যবহার আপনার জামাকাপড়ের চেহারাকে পাল্টে এমনই চমকদার করে তুলবে যা দূর থেকেও নজরে পড়বে !

সুপার রিন—অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট পাউডার বা বারে কাচা কাপড়ের চেয়ে অনেক বেশী ঝক্‌ঝকে সাদা ক'রে ধোয়। কারণ, সুপার রিন-এর শুভ্রতা আনার শক্তি যে অনেক বেশী !

চাক্ষুষ প্রমাণ করে নিন:

অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট বারে ধোয়া

সুপার রিন-এ ধোয়া

সুপার রিন-এ আছে শুভ্রতা আনার অনেক বেশী শক্তি !

হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RIN.40-1810 BG

মৈথিলী ব্রাহ্মণ অনেক আছে। কারুর-কারুর বাস দেড়শো দুশো বছর।"

আবার খেই ধরলেন চক্রবর্তী মশাই :

মিশ্রদের ছোট দু ভাই, বরদা আর সারদা, ছোটবেলায় স্কুলে পড়ত আমার সঙ্গে, কলকাতায়। বড় ভাই অন্নদা খাওয়াদাওয়া নিয়ে একটু বেশি ব্যতিব্যস্ত থাকায় স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে আর ঢোকেনি। বরদা সারদার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়। অবশ্য দুজনে পড়ত একই ক্লাসে। আসলে ওরা ঘণ্টা কয়েকের জন্যে স্কুলে খাওয়াদাওয়া করতে আসত। ওদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে মস্ত গাড়ি চড়ে যাতায়াত। দুজনের চেহারা অনেকটা একই রকম। ক্লাসের সব ছেলেই লম্বায় ওদের বুকের নীচে। সাধারণ স্বাস্থ্যের চারজন ছেলে হাত-ধরাধরি করে বেড় দিলে হয়তো দুই ভাই সেই সার্কলের মধ্যে ধরা পড়ত। একেক জনের জামা তো নয়, যেন ছোটখাটো তাঁবু। সে-জামায় আবার স্পেশাল মাপের সাইড পকেট থাকত। সেই পকেটের আবার এমন রাক্ষুসে হাঁ যে, এক পাউণ্ড ওজনের একটা পাঁউরুটি আড়াআড়িভাবে তার মধ্যে ঢুকে যেত। দু ভাইই নোংরার বেহদ্দ। পকেটে করে মাখন রুটি আর গাদা গাদা ডিমের ওমলেট আনত। খেত ক্লাসের মধ্যেই। মুখ চলছে তো চলছেই। ওদের বাবা মোটা ডোনেশান দিতেন স্কুলে। মাস্টারমশাইরা তাই এ-সব দেখেও দেখতেন না।

এ ছাড়াও টিফিনের সময় দুজন চাকর দু'ভাইয়ের জন্যে খাবার আনত। সেই খাবারের মেন আইটেম হচ্ছে ছোট এক পেতলের বালতি ভর্তি দুধ আর এক টিফিন কেরিয়ারে ঠাসা সন্দেশ। প্রত্যেক ভাইয়ের জন্যে আলাদা দুধের বালতি, টিফিন কেরিয়ার, আর তা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আলাদা চাকর।

খেতে আমিও ভালবাসতাম। তাই পালে পার্বণে বরদা আর সারদা আমাকে নেমন্তন্ন করত ওদের বাড়ি। বেশির ভাগ সময়েই নানান ছুতোয় এড়িয়ে গেছি। ওদের পেল্লায় বাড়ির দেড় তলার সমান উঁচু বিশাল বিশাল ঘরের মতো আর সব কিছুই অনেক বড় মাপের। খাবার থালা তো নয়, ছোটখাট কুয়োর ঢাকনা। ফুলের টবকে লম্বাটে ছাঁদে বানালে যা হয়, তাই হল ওদের বাড়ির গেলাস। আর বাটি হল ডল-পুতুলের চান করার গামলা। ওই রকম থালা, গেলাস আর বাটিতে খাওয়া রীতিমত কসরতের ব্যাপার।

একবার তিন ভাইয়ের সঙ্গে খেতে বসেছি। প্রায় বোয়ালের বাচ্চার সাইজের এক একটা পাবদা মাছ। আমি খেলাম দেড়খানা, ওরা তিন জনে প্রায় দু ডজন। তেমনি মানানসই চিংড়ি, এখন যা উড়ে গিয়ে বিদেশের বাজার আলো করছে। আমি কোনো রকমে দুটো, ওরা একেক জন ছ সাতটা করে। মাংস আমি আর খেলাম না। ওরা দু-তিনবার জামবাটি ভরে নিল। আমার পাখির খাওয়া দেখে ওদের কী হাসি। বড় ভাই অন্নদা বলল, তুমি হাত ধুয়ে এসে বোসো, কেন অনর্থক হাতে এঁটো শুকিয়ে চড়চড় করবে। আমরা এখনও অনেকক্ষণ ধরে খাব। তাই করলাম।

পরের বছর বরদা আর সারদার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। যুদ্ধ, কলকাতায় জাপানি বোমা, তারপর দুর্ভিক্ষ, রেশান। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট দেখে ওরা ওদের দেশ মালদায় চলে গেল। সেখানে ওদের আমবাগান ছিল। আমের সময় এক-এক জন যখন-তখন দশ বারোটা ফজলি আম খেয়ে নিত বলে শুনেছি।

ওদের স্কুল ছাড়ার পর বহু বছর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। বছর সাত-আট আগে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম শিলিগুড়িতে। ফেরার সময় দার্জিলিং মেলে ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে চড়িয়ে দিল ওরা। রাত এই বারোটা নাগাদ ঘুম ভাঙিয়ে নতুন যাত্রী এল মালদা স্টেশানে। যিনি কামরায় ঢুকলেন, কাত হয়ে ঢুকতে হল কামরাতে। তাঁর দেহভার ধারণ করতে হলে ফার্স্ট ক্লাসের বার্থকেও দেড় গুণ চওড়া করতে হয়। তিনি হাত উঁচু করলেই নাগালের মধ্যে কামরার ছাদ। কাঁচাপাকা ঘাড়ছাঁটা চুল। মুখ তো নয়, রাক্ষুসে সাইজের পেঁপে একটি। তাতে তিন থাক চিবুক। এক লহমায় অনেকগুলো বছরের পর্দা গুটিয়ে গেল। বললাম, "বরদা না?"

"হ্যাঁ," ঘুরতে একটু সময় লাগল তাঁর, বললেন, "আমি বরদা, আপনি, আপনাকে তো ঠিক," কেমন একটু থতমত।

"চিনতে পারছ না? আমি দেবেশ, দেবেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন স্কুলে পড়তাম একসঙ্গে," আমি স্মৃতির একটা খুঁট বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করি।

"দেবু," চেঁচিয়ে উঠল বরদা। আর মাংসের একটা পাহাড়ের সঙ্গে পেয়াই হয়ে আমার প্রাণান্ত অবস্থা। তারপর দুজনেই কথায় ছাপাছাপি।

মাঝখানে কেটে যাওয়া এতগুলো বছরের হিসেবনিকেশ। জানলাম তিন ভাইই বহাল **তবিয়তে** আছে। এখনও **খাওয়াদাওয়া** চালিয়ে যাচ্ছে পুরো দমে। তিন জনেরই ঘর ভর্তি নাতি-নাতনি। স্কুলে কলেজে পড়ে। দুঃখের কথা, একালের **এই ছেলেগুলো** একেবারেই খেতে পারে না। উলটে দাদুদের বৃকোদর, ঘটোৎকচ, গ্লাটন এই সব বলে ঠাট্টা করে। বরদা বলল, আসিস এক দিন, সেই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতেই আছি।

তারপর আরও বছর দুই কাবার। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে এর মধ্যে। খাবার ব্যাপারে নানান **ধরনের** বাধা-নিষেধ। একদিন দুপুরে যাচ্ছি এইট বি বাসে। হঠাৎ নজরে পড়ল ল্যান্সডাউন রোডের সেই বাড়িটা। নেমে পড়লাম পরের স্টপে। তিন ভাইকেই পেয়ে গেলাম একতলায়।

আমাকে দেখে হই-হই করে উঠল ওরা। বরদা বলল, "খুব ভাল সময়ে এসেছিস রে দেবু। দাদা ভাল খবর এনেছে। তুইও চল। খাবি দুপুরে আমাদের সঙ্গে।"

"ব্যাপারটা কী," জিজ্ঞাসা করলাম। ভাল খাওয়ার পালা যে আমার শেষ, সে-কথা আর ভাঙলাম না।

"পার্ক স্ট্রীটের 'রাঁদেভু' - রেস্তোরাঁয় দশ টাকায় বুফে লাঞ্চ, যাকে বলে পেটচুক্তি খাওয়া। তুইও চল।" বলল সারদা।

তখন বললাম আমার আর ওদের খাওয়ার মেনুতে কত তফাত এবং কেন তফাত।

"আহা, মরতে যখন হবেই, তখন খেয়ে মরাই তো ভাল," আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলল বড় ভাই অন্নদা।

"ঠিক আছে," আমি বললাম, "খাব না বলেছি, যাব না এ-কথা তো বলিনি। তোমরা এই বয়েসে আগের মতো খেতে পারো, এ তো দেখেও আমার আনন্দ।"

ওদের সেই আগের আমলের বিশাল গাড়িতে চড়ে গেলাম 'রাঁদেভু' রেস্তোরাঁয়। উর্দিপরা দারোয়ান গাড়ির দরজা খুলে এক লম্বা সেলাম। মিশ্র ব্রাদার্স ফিরেও তাকাল না। ঢোকার আগে দরজার পাশে দেখলাম বোর্ডটা—কুইক লাঞ্চ, রুপিজ টেন ওনলি। অবশ্য তখনকার দিন হিসেবে দশ টাকা খুব কিছু একটা শস্তা নয়।

ঢুকতেই এক রাশ ঠাণ্ডা হাওয়া এসে জড়িয়ে ধরল। মিশ্র ব্রাদার্সের মাথায় টগবগ করে ফুটছে একটাই চিন্তা : দশ টাকায় পেটচুক্তি খাওয়া। তিন ভাই ঢুকতেই লাঞ্চ আওয়ারে জড়ো লোকজনের ঘাড় কমবেশি ঘুরে গেল। ঘুরবেই বা না কেন। মুগার পাঞ্জাবি আর দিশি ধুতিপরা তিনটি দানব। তিনজনের শরীরের মেদমাংস দশজন সাধারণ লোকের চেহারার মানুষের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিলিবাঁটোয়ারা করে দেওয়া যায়। ম্যানেজার নিজে উঠে এসে বাও করে দাঁড়াল।

বড় ভাই অন্নদা তার নিজস্ব ইংরিজিতে বলল, "বেলিফুল লাঞ্চ অ্যাট টেন রুপিজ, হোয়ার?"

"দিস ওয়ে স্যার," ম্যানেজার নিজেই নিয়ে গেল ঘরের কোণে বুফে টেবিলের দিকে। বুঝতেও পারল না খাল কেটে কী তিনখানা কুমির ঢোকাল।

একটু পরেই ম্যানেজার ভড়কে গেল। তিন ভাইই ডিশে ফ্রায়েড্ রাইস, চিকেন কারি, পনির মটর, ফিশ ফ্রাই মায় সালাড পর্যন্ত তুলছে তো তুলছেই। তিনজনের ডান হাত কাঁটাচামচে ছাড়াই মুখ আর ডিশের মধ্যে চলছে পিস্টনের মতো। দেখতে-দেখতে ডিশ খালি। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। ভীমের মুগুরের মত কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে অন্য খদ্দেররা সরে দাঁড়াল। এ তো ঠিক খাওয়া তো নয়, শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যদের কামান দাগা। লোড্, এ২ম, ফায়ার। বাড়িয়ে বলছি না। ঘড়ির ওপর নজর ছিল। ঠিক বারো মিনিটে টেবিল সাফ। চিকেনের গ্রেভি, ফিশ ফ্রাইয়ের গুঁড়ো আর সালাডের কটা ধনেপাতা ছাড়া আর কিছু পড়ে রইল না। ঘরে কবরখানার নীরবতা। এয়ার কণ্ডিশাণ্ড ঘরেও সব লোকের কপালে চিনচিন করে ঘাম। আর ম্যানেজার? তাকে দেখলে মনে হবে দাঁড়িয়ে আছে স্রেফ মনের জোরে।

টেবিলের খাবার শেষ হলে তিন ভাইয়ের অন্য দিকে তাকানোর ফুরসত হল। সবাই সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে। তিনখানা চেয়ারে দেহ ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে তিন ভাই হাঁক ছাড়ল, "ম্যানেজার।"

ম্যানেজারের কাঁধ, চোয়াল, টাই তখন ঝুলে পড়েছে। তার গলা দিয়ে একটা ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ বের হল। তার নানান রকম মানে হয়।

"ব্রিং মোর ফুড," বলল অন্নদা।

"বাট স্যার," তেমনি ফ্যাসফ্যাসে গলায় ম্যানেজার বলল, "আর তো খাবার নেই। আপনারা তো সব খেয়ে ফেলেছেন। আমার ভাগ্য

ভাল যে, ডিশ আর কাঁটাচামচগুলো আপনারা ছেড়ে দিয়েছেন।"

"ও সব নেহি জানতা হ্যায়," অন্নদা ইংরিজিতে ঘাটতি পড়ায় হিন্দির সাহায্য নিল, "খানা লে আও, পেটমে আগ্ জ্বলতা।"

"সরি স্যার," ম্যানেজার এবার একটু শক্ত হবার চেষ্টা করল। জানাল আর খাবার দেওয়া সম্ভব নয়।

"হোয়াট?" বরদা আর সারদা গর্জন করে উঠল। এক হুংকারেই সব টেবিলের লোকজন চমকে উঠল। উর্দিপরা ওয়েটারগুলো সব স্ট্যাচু। কেউ কোথাও সার্ভ করছে না।

"সি, দিস ইজ আওয়ার লইয়ার," আমাকে দেখিয়ে বলল বরদা, "বেলিফুল দশ টাকায় দেবে বলে কড়ার করেছে। খাবার না দিলে চুক্তি ভাঙার মামলা করে দশ লাখ টাকা খেসারত আদায় করব; দেখি কেমন করে তোমরা লোক ঠকিয়ে যাও।"

সারদা আবার কখন এর মধ্যেই গিয়ে তুলে নিয়ে এসেছে কুইক লাঞ্চের বোর্ডটা।

"এই বোর্ড সারা ক'লকাতায় দেখাব," সারদা বলল আমার দিকে তাকিয়ে, "এই ম্যানেজারটাকে বুঝিয়ে বলো না মামলা করলে ওর কী অবস্থা হবে।"

উকিল না-হয়েও ম্যানেজারকে আমি বোঝালাম, মামলা হলে কাগজে ছাপা হবে। দোকানের সুনাম চুলোয় যাবে। তাছাড়া মোটা টাকা খেসারত তো দিতে হবেই। পিঠে হাত দিয়ে বোঝাতে গিয়ে দেখি ম্যানেজারের কোটটা পর্যন্ত ঘামে ভিজে প্যাচপ্যাচ করছে। ম্যানেজার অবশ্য ততক্ষণে বুঝে গেছে আপাতত তার একটিই কাজ। তা হল হাত, পা, আর মাথা-বসানো এই তিনটে পিপের মধ্যে এন্তার খাদ্যবস্তু ঠেসে যাওয়া।

মিশ্র ব্রাদার্স ছাড়া ঘরে আর কেউ বসে নেই। সবার চোখে মুখে সে কী ভক্তি আর শ্রদ্ধা। তার উপর তিন ভাই থেকে-থেকে হাঁক ছাড়ছে, "বেলি বার্নিং, ব্রিং ফুড।"

বিদ্ধস্ত ম্যানেজার একেবারে নেতিয়ে পড়ে ওয়েটারদের বলল, "লে আও যো কুছ হ্যায়।" তারপর থেকে "লে আও" কথাটা মিশ্রদের তিন ভাই খাওয়ার ফাঁকে-ফাঁকে ছুড়ে মারতে লাগল।

বকরাক্ষসদের ভোজনপর্ব এক সময়ে শেষ হল। ম্যানেজার নিজের কাউন্টারের টেবিলে মুখ গুজরে পড়ে। খেয়েদেয়ে গেলাসের জল দিয়ে ডিশে হাত ধুয়ে,রুমালে মুখ মুছতে মুছতে তিন ভাই ম্যানেজারের সামনে হাজির। বড় মিশ্র তিনখানা দশ টাকার নোট রাখল কাউন্টারের উপর। বলল, "ওহে ম্যানেজার, এই নাও দাম। তিন দশে তিরিশ টাকা। তঞ্চকতা পাবে না আমাদের কাছে।" ম্যানেজার মুখ আর তোলেই না।

"থ্যাংক ইউ," বরদা বলল, "কাল আবার আসব খেতে। আজ এই হই-হট্টগোলে খেয়ে তেমন জুত হল না।"

ম্যানেজারের গায়ে যেন চারশো চল্লিশ ভোলটের শক। এক লাফে খাড়া। চোখ ভিজে-ভিজে। বোধ হয় কাঁদছিল। মুখ ফ্যাকাশে তবু তোতলাতে-তোতলাতে বলল "হো-হো-হোয়াট, ইউ উইল কাম এগেন টুমরো?" বলেই ধপ করে আবার চেয়ারে। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে।

সারদা বলল, "আসব না মানে, দশ টাকায় পেটচুক্তি খাওয়া। উই উইল কাম এগেন অ্যান্ড এগেন।" এবারে ম্যানেজারের মাথাটা টেবিলের সঙ্গে ঠুকে গেল। টেরও পেল না বোধ হয়। অজ্ঞান হয়ে গিয়ে থাকবে।

চক্রবর্তী মশাই থামলেন।

বিষ্ণু বিশ্বাস মুখিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল "আবার ওঁরা গিয়েছিলেন খেতে?"

"গিয়েছিলেন," চক্রবর্তী মশাই গম্ভীর গলায় বললেন, "দেখা গেল দরজা বন্ধ। সামনে নোটিস টাঙানো—ক্লোজ্‌ড।"

ছবি দেবাশিস দেব

অদ্যাবধি যত লোক টাকা জাল করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি হচ্ছেন জুলিয়াস সীজার। নানা রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে অনেক টাকা লাগে। কিন্তু রোমের সেনেট তাঁকে সব সময় তাড়াতাড়ি টাকার যোগান দিতে চাইত না। তাই তিনি নিজেই টাকা তৈরি করে বাজারে ছাড়তে শুরু করলেন, তাতে থাকল তাঁর নিজের প্রতিকৃতি। পরে দেখা গেল, সেনেটের সরকারি টাকার চেয়ে জুলিয়াস সীজারের টাকার কদর বাজারে বেশি। অগত্যা সেই টাকাকেই সরকারি স্বীকৃতি না-দিয়ে উপায় থাকল না

॥ প্রকাশিত হয়েছে ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের

দক্ষিণারঞ্জন রচনাসমগ্র

দ্বিতীয় বা শেষ খণ্ড

২৫৲

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী :—

দাদামশায়ের থলে ● আশীর্বাদ ও আশীর্বাণী ● ঠাকুরদার ঝুলি ● আমার দেশ
চারু ও হারু ● উৎপল ও রবি ● খোকাখুকুর খেলা ● কন্যকা কুন্তী ● কিশোরদের মন
প্রথম কথা ● গ্রাম্য-গীতি ● ক্যাঙ্গারু (গল্প) ● চিঠিপত্র ● লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিশোর সাহিত্য-সমগ্র

১ম খণ্ড ১৫·০০
২য় খণ্ড ১৬৲ ৩য় খণ্ড ১৪৲

৩ খণ্ডের সূচী :—

প্রথম খণ্ড : রাজকুমার, লালচিঠি, অশরীরী আতঙ্ক নিশীথরাতের তীরন্দাজ, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে

দ্বিতীয় খণ্ড : শংকর (প্রথম ভাগ) বিস্ময়ের ইন্দ্রজাল কালোভ্রমর বিষের তীর বাদশা লাল নিশান প্রণাম জানাই (১ম) প্রণাম জানাই (২য়)

তৃতীয় খণ্ড : শংকর (দ্বিতীয় ভাগ) রক্তহীরা রক্তসন্ধ্যা চোর কাঁটা

১২৲ বই মাত্র ৪·৫০ টাকায়

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
সেই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

ঠাকুরমার ঝুলি

পেপার ব্যাক সংস্করণ
দাম সাড়ে চার টাকা

২৭৪ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই
শিশু বন্ধুরা এই সুলভ সংস্করণে
পাবেন।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, -৭৩

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি হাজারিবাগের পিসিমার কাছে পাওয়া এই পুরনো আঙটি ? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার আসল পরিচয় কী ? ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে রহস্যময় মানুষ সিংহীবাবু ও সুখিয়ার খবর পায়। প্রয়াগ আর সুখিয়া কি একই লোক! বংশীকে নিয়ে সিংহীবাবুর বাড়িতে ঢোকে শিশির। তারপর....

।। ১৩ ।।

ভেতরে অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ছিল না।

বংশী বলল, "টর্চ আছে ?"

"না।" বলে শিশিরের আফসোস হল। টর্চ রাখা উচিত ছিল। এ-সব জায়গায় টর্চ ছাড়া সন্ধের পর বেরুনো উচিত নয়, বিশেষ করে এই বর্ষা-বাদলার দিনে। ভুল হয়ে গিয়েছে শিশিরের।

"দেশলাই ?"

"না," শিশির মাথা নাড়ল।

বংশীর পকেটেও নস্যির ডিবে ছাড়া অন্য কিছু নেই।

অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে বংশী বলল, "এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে কি না তাও জানি না।"

শিশির কিছু বলল না। এদিককার রাস্তায় সবে ইলেকট্রিকের লাইন টানা হয়েছে, কোনো-কোনো বাড়িতে আলো-টালো জ্বলে, তবে সব বাড়িতে এখনও ইলেকট্রিক পৌঁছোয়নি।

বংশী দেওয়ালে হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, "তুমি একটা জিনিস লক্ষ করেছ ?"

"কী ?"

"ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গন্ধ তেমন নেই।"

শিশির লক্ষ করেনি। নাক টানল বার কয়েক। বলল, "তাই মনে হচ্ছে।"

"ঘর যদি অনেকদিন বন্ধ থাকত, গন্ধ হত না ?"

কথাটা ঠিকই বলেছে বংশী। শিশির বলল, "কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, এ-বাড়িতে কেউ থাকে না।"

"তুমি বোধ হয় তখন ভাল করে দেখোনি সব। তাছাড়া বাড়ির পেছন দিকও রয়েছে। সেখান দিয়ে কেউ যদি আসা-যাওয়া করে তুমি বুঝবে কেমন করে।"

শিশির যতটা পারে ঘরটা লক্ষ করছিল। অস্পষ্ট ভাবে কয়েকটা জিনিস তার নজরে আসছিল। একপাশে ফাঁকা তক্তপোশ, টিনের চেয়ার একটা, একরাশ খবরের কাগজ, ছেঁড়া জামাটামা মাটিতে পড়ে আছে, আর তক্তপোশের ওপর কিছু শিশি বোতল।

বংশী বলল, "তুমি একটু দাঁড়াবে। আমি একটা আলো জুটিয়ে আনি।"

"আলো ? পাবে কোথায় ?"

"পেয়ে যাব। ওদিকে কামাখ্যাদার বাড়ি। না হলে কিশোরদের বাড়ি আছে। দাঁড়াও একটু।" বংশী বাইরে যাবার জন্যে দরজার দিকে পা বাড়াল। "ভয় করবে ?"

শিশির অবাক হল। "ভয়! কেন ?"

"না, এমনি বলছিলাম। তুমি না হয় বাইরে এসে দাঁড়াও। আমি আসছি।"

বংশী চলে গেল।

শিশির বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

চারদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। রাস্তা দিয়ে কেউ চলে যাচ্ছিল। রেল-ফটকের দিকে মালগাড়ি যাবার শব্দ। এই শব্দটা শিশির বেশ চিনে ফেলেছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে শিশির ভাবছিল। কোথাকার জল কোথায় যে গড়িয়ে যাচ্ছে কে জানে। সবই কেমন ধাঁধা। আঙটি থেকে শুরু করে যা-যা ঘটছে তার কিছুরই মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন-কী, এই সিংহীবাবুও এক ধাঁধা। সকালে এই বাড়িতে এসে শিশিরের একরকম মনে হল, আর সন্ধেবেলায় এসে অন্য রকম হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এ-বাড়িতে মানুষের আসাযাওয়া আছে।

নয়ত তালা আলগাভাবে লাগানো থাকবে কেন? কেন ঘরের মধ্যে গুমোট, ভ্যাপসা গন্ধ থাকবে না?

শিশির আবার আকাশের দিকে তাকাল। তারা ফুটেছে। বাতাসে বাদলার ভাব থাকলেও কেমন এক গন্ধ। হয়তো শরতের। কে জানে ভাদ্র মাস শেষ হয়ে গেল কিনা!

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে দাঁড়াল শিশির। এইভাবে একা-একা অন্ধকার নির্জন বাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগছিল না। ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু অস্বস্তি কেমন করে তাড়াবে!

আকাশের দিকে আবার একবার তাকাল শিশির। দেখতে-দেখতে আরও কত তারা ফুটে উঠল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে শিশির কিসের শব্দ শুনে মুখ ফেরাল। আশেপাশে কেউ নেই। তা হলে শব্দ হল কিসের? গাছপালার?

শিশির কান পাতল। নজর করল চারপাশ।

বাড়ির পেছন দিকেই শব্দ হয়েছে। কিসের শব্দ? কেউ কি রয়েছে পেছনে? নাকি কেউ পেছন দিক দিয়ে ঢুকছে বাড়িতে! শিশির এ-বাড়ির কিছুই জানে না। পেছন দিয়ে কি ঢোকার রাস্তা আছে? রাস্তা যদি নাও থাকে, পাঁচিল টপকে নিশ্চয় ঢোকা যায়।

কিন্তু কে এসেছে পেছনে? সিংহীবাবু?

শিশির রাস্তার দিকে তাকাল। বংশী আসছে না কেন?

চঞ্চল হয়ে শিশির বাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাড়িটার পেছন দিক দেখতে পাচ্ছে না। না পেলেও সে জানে, বাড়ির পেছন দিকে মাঠ, মাঠের পর মস্ত পুকুর। কোনো লোক যদি মাঠ আর পুকুরপাড় দিয়ে আসে কিংবা চলে যায়—এখান থেকে দেখা বা বোঝার উপায় নেই। এই অন্ধকারে তো নয়ই।

আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর রাস্তায় আলো পড়ল। কেউ আসছে। টর্চ ফেলছে বারবার। বংশী।

বংশী আরও কাছে এল।

"তুমি রাস্তায়?" বংশী বলল।

"হ্যাঁ। শোনো, বাড়ির পেছন দিকে আমি একটা শব্দ পেয়েছি।"

সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ ফেলল বংশী। গাছপালা, পাঁচিলে আলো পড়ল।

"কেমন শব্দ?" বংশী জিজ্ঞেস করল।

"নড়াচড়ার মতন....।"

"চলো, দেখি।"

ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গাছপালার পাশ দিয়ে পেছনে যাবার চেষ্টা বৃথা হল। পথ নেই। কম্পাউণ্ড ওয়ালের সঙ্গে বাড়ির দু দিকেই ইটের গাঁথনি তোলা। গাঁথনির মাথায় কাচের টুকরো। যাবার রাস্তা বন্ধ। তার মানে, সরাসরি কেউ বাগান দিয়ে পেছনে যেতে পারবে না।

বংশী টর্চ ফেলে ইটের গাঁথনি দেখতে দেখতে বলল, "অদ্ভুত। এ-রকম আর দেখা যায় না। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ?"

"কী?"

"এই গাঁথনি কিন্তু খুব পুরনো নয়।"

"বুঝলাম না।"

"গাঁথনি নতুন। একেবারে দু-চার দিনের মধ্যে নয়, কিন্তু, কয়েক মাস আগেকারও নয়। ইচ্ছে করেই এটা করেছে।"

"কেন?"

"যে-কোনো লোক হুট করে ঢুকে পেছন দিকে যেতে পারবে না।"

শিশির চুপ করে থাকল।

বংশী বলল, "চলো, ভেতরে যাই। ব্যাপারটা দেখে আসি।"

সিঁড়ি দিয়ে আবার বারান্দায় উঠে দু জনে ঘরে ঢুকল।

বংশী আলো ফেলল ঘরের চারপাশে। ফাঁকা তক্তপোশ, টিনের চেয়ার, পুরনো কাগজ ছাড়াও যা চোখে পড়ল তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ঘরের একপাশে একটা কোদাল আর কুড়ুল রাখা আছে।

ঘরের ভেতর দিকের জানলা বন্ধ। ভেতর আর পাশের ঘরের দরজাও বন্ধ। ধাক্কা দিল বংশী। কোনোটাই খুলল না।

জানলা দেখতে-দেখতে বংশী বলল, "ব্যাপার দেখেছ। এদিকে ছিটকিনি জানলা তো খুলে যাওয়া উচিত। তবু খুলছে না। তার মানে-ও-পাশ থেকেও বন্ধ করা আছে। দরজারও সেই অবস্থা। ভেতরের, পাশের কোনো দরজাই খোলা যাবে না।"

"তা হলে?"

"উপায় নেই। ফিরে যেতে হবে।"

কথা বলল না শিশির।

বংশী আরও বার-দুই দরজায় লাথি মারল। তারপর বলল, "আজ আর কিছু করা যাবে না। কাল দেখব।"

ঘরের বাইরে এল বংশী। দরজা বন্ধ করল। "তালাটা ঝুলিয়ে দিয়ে যাই।"

কোনো রকমে তালাটা কড়ায় ঝুলিয়ে বংশী বলল, "ব্যাপারটা বেআইনি হল। তাই না?"

"বেআইনি?"

"লোকের বাড়ি ঢুকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম, বেআইনি হল না? সিংহীবাবু থানায় ডায়রি লেখাতে পারেন।"

শিশির প্রথমটায় খেয়াল করেনি। হঠাৎ তার মাথায় এল, আচ্ছা—সিংহীবাবু কি স্রেফ ইচ্ছে করেই তালাটা খুলে রেখেছিল! শিশিরদের ফাঁসাবার জন্যে।

"বংশী?"

"বলো।"

"এটা ফাঁদ নয় তো!....আমাদের ঘরে ঢোকাবার জন্যে তালা খুলে রাখা হয়েছিল।"

বংশীর খেয়াল হল কথাটা। ভাবল। বলল, "হতে পারে ফাঁদ। কিন্তু আমরা যে এসেছিলাম তার প্রমাণ কোথায়?"

বংশীর পুরো কথা শেষ হবার আগেই রাস্তায় কার গলা পাওয়া গেল।

তাকাল বংশী। আলো ফেলল।

"ননীকাকা।"

শিশির তাকাল। মুখ দেখল।

ননীবাবু কাছাকাছি এলেন। দাঁড়ালেন। "কে, বংশী না?"

"হ্যাঁ।"

"এদিকে কোথায়? ওটি কে! মুখ দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"শশধরবাবুর আত্মীয়। কলকাতা থেকে এসেছে। আসে মাঝে-মাঝে।"

"তাই চেনা-চেনা মনে হল। তা কোথায় গিয়েছিলে এদিকে?"

"এই এসেছিলাম। আচ্ছা, আপনি সিংহীবাবুকে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। কবে যেন দেখলাম। পরশু না তরশু। দেখেছি।"

বংশী শিশিরের মুখের দিকে তাকাল।

(ক্রমশ)

ছবি সুনীল দীল

ছোটদের যত সেরা বই

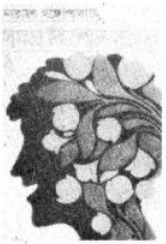

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি টেনিদা। ছোটবড় নির্বিশেষে সকলের প্রিয় এই টেনিদার যাবতীয় কাহিনী একসঙ্গে সকলের হাতের মুঠোয় যাতে পৌঁছে যায় তার জন্যই খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমগ্র কিশোর সাহিত্য। শুধু টেনিদার আশ্চর্য মজাদার কাহিনীগুলিই নয়, সেইসঙ্গে থাকছে আরও অনেক দুর্ধর্ষ সব উপন্যাস-গল্প-ছড়া কবিতা আর প্রবন্ধ। এতদিন একখণ্ড নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছিল, এখন আবার দ্বিতীয় খণ্ডও বেরিয়ে গেছে। এই নতুন খণ্ডে রয়েছে গল্প ছাড়াও তিনতিনটে দারুণ হাসির নাটক। যে-নাটক করতে মজা, পড়তে গেলেও কম মজা নয়।

টেনিদা চরিত্রটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সৃষ্টি করেছিলেন কীভাবে, সত্যিই টেনিদা নামে কেউ আছেন কিনা, থাকলে তিনি কোথায় থাকেন, সত্যিই পটলডাঙায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে দেখেছিলেন কিনা, দেখে থাকলে কবে এবং কীভাবে, কত লোককেই তো দেখেন লেখকরা, হঠাৎ টেনিদাকেই বা লেখক বেছে নিলেন কেন, এমন স্মরণীয় চরিত্র হিসেবে তাঁকে আঁকলেনই বা কেন — এমন বহু প্রশ্ন আমাদের মনে জেগে ওঠে। সেই প্রশ্নগুলোর কথা মনে রেখেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী একটি বই লিখেছেন, 'আসল টেনিদা' নামে'। টেনিদার পরিচয়-জানানো এই টেনিদাকে নিয়েই একটি নতুন উপন্যাস।

পুর্ণেন্দু পত্রীর কী করে কলকাতা হলো ৫ ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫ কলকাতার রাজ-কাহিনী ৫ **মৌমাছির** রাজার রাজা ৭ **সরলা-বালা সরকারের** পিনকুর ডাইরি ৩ **পাপু (সুব্রত সরকার)-র** পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫ **সংকর্ষণ রায়ের** গভীর গহন ৭ **পার্থ-সারথি চক্রবর্তীর** কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫ মজার এক্সপেরিমেন্ট ৫ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আজব কথা ৫ রসায়নের ভেল্‌কি ৪ ম্যাজিকের মতো মজা ৫ তত সহজ ছিল না ৫ **সুকুমার রায়ের** সুকুমার সাহিত্য সমগ্র ১ম ২৫ ২য় ৩০ জীবজন্তু ৮ সমগ্র শিশু-সাহিত্য ১০ **বুদ্ধদেব গুহর** ঋজুদায় সঙ্গে জঙ্গলে ৫ মউলির রাত ৫ বনবিবির বনে ৬ **ননীগোপাল চক্রবর্তীর** চরকাবুড়ি ৪ যাদু-ঘরে চল যাই ৬ **মতি নন্দীর** ননীদা নট আউট ৫ স্ট্রাইকার ৭ স্টপার ১০ কোনি ৭ ক্রিকেটের আইন কানুন ১০ খেলার যুদ্ধ ১২ **বিমল করের** ওআওার মামা ৭ কাপালিকরা এখনও আছে ৮ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১০ **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিমল দাসের** সাদা বাঘ ১০ **অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর** শাদা ঘোড়া ৮ **অজেয় রায়ের** ফেরোমন ৬ **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের** মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬ গোঁসাইবাগানের ভূত ৮ **গৌর-কিশোর ঘোষের** দুষ্টুর দুপুর ৪

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪ ৪৩৬২

কাকের বিচার

অজেয় রায়

নুকাইদের বাড়ি এক মহা উৎপাত ছিল—কাক!

নুকাইরা থাকে দোতলায়। পুবদিকে একটা টানা খোলা বারান্দা। সেখানে সকাল থেকে দুপুর অবধি রোদ পড়ে। তাই বড়ি আচার ধোয়া-মসলা ইত্যাদি রোদে দেওয়া হয়। শীতকালে ওই বারান্দায় বসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে নুকাইয়ের মা ব্লোজ চাল বাছেন। নুকাই আর তার বোন ঝুমঝুমি টিফিন খায়। কিন্তু কাকের জ্বালায় কারও স্বস্তি ছিল না।

চারপাশ থেকে গাদা-গাদা কাক দিনভোর বারান্দাটার দিকে তাক করে থাকে। আর সুযোগ পেলেই এসে চট করে কিছু মুখে নিয়ে উড়ে পালায়।

সব সময় যে তারা খাবার জিনিস পেত তা নয়। কিন্তু যা পায় তাই সই। ঠুকরে ঘেঁটে এঁটো করত বড়ি আচার। চামচ বা ছোট বাটি পেলে মুখে তুলে নিয়ে চলে যেত। আর সেগুলো খুঁজে পাওয়া যেত না।

একদিন নুকাইয়ের মা বারান্দায় সেলাই করতে-করতে একটু উঠে ঘরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন, সুতোর গুলিটা উধাও। আর সামনের ছাদে বসে এক কাক মহানন্দে সেই সুতোর গুলিকে ঠুকরে জট পাকাচ্ছে। ব্যাস, গেল অতখানি সুতো।

নুকাইরা কাকেদের ভয় দেখাত, ঢিল ছুঁড়ত—কাকেরা গ্রাহ্যই করত না।

নুকাইয়ের মা মাঝে-মাঝে খেপে গিয়ে নুকাইয়ের বাবাকে বলতেন, "বাড়িওলাকে বলো বারান্দাটা জাল দিয়ে ঘিরে দিতে। আর পারা যায় না!"

কথাটা উঠলেও কাজে আর এগোত না। কারণ অনেক বাধা। বাড়িওলা পয়সা খরচ করতে চায় না। অতএব নুকাইয়ের বাবাকে নিজের গাঁটের পয়সা দিয়ে জাল লাগাতে হয়।

তাছাড়া নুকাইদের ছাদ নেই, আর-কোনও বারান্দাও নেই। ভিজে জামাকাপড় শুকোতে দিতে ওই বারান্দাটুকুই সম্বল। বারান্দার রেলিংয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কাচা শাড়ি। বারান্দা ঘেরায় নুকাইয়েরও আপত্তি। কারণ ওই বারান্দা থেকে সে ঘুড়ি ওড়ায়।

একদিন ঝুমঝুমি বারান্দায় বসে তেলমুড়ি খাচ্ছিল। একটু আনমনা হয়েছে। অমনি এক কাক এসে তার বাটিসুদ্ধ মুড়ি নিয়ে পালাল। ঝুমঝুমি তো কেঁদেকেটে একশা।

নুকাইদের বাড়ি একজন কাজ করত। নাম তার দুবরাজ। দুবরাজের রং কালো, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। ছেলেবেলায় দুবরাজ থাকত গ্রামে। পাহাড়ের নীচে, বনের ধারে তাদের গাঁ। দুবরাজের বাবা-কাকারা শিকার করত, পশুপাখি ধরত। সে-সব দুবরাজ নাকি শিখেছিল। প্রায়ই সে নুকাই আর ঝুমঝুমিকে গল্প বলত। বাঘ-ভাল্লুকের গল্প। শিকারের গল্প। তার নিজের দেখা বা শোনা সত্যি ঘটনা সব। হাঁ করে শুনত দুই ভাইবোন।

ঝুমঝুমির কান্না দেখে দুবরাজ বেজায় রেগে বলল,"দাঁড়াও, ওদের জব্দ করছি। দেখাচ্ছি মজা।"

পরদিন সকালে দুবরাজ বারান্দায় এক ফাঁদ পাতল।

ছোট ছোট কাঠিতে সরু দড়ি আর রবার বেঁধে কেমন এক ফাঁস বানিয়ে সে বারান্দায় পেতে রাখল। আর কিছু মুড়ি ছড়িয়ে রাখল সেখানে। সবাই বারান্দা ফাঁকা করে সরে গেল।

একটু পরেই এক কাক এসে মুড়ি খেতে লাগল লাফিয়ে-লাফিয়ে। খেতে খেতে যেই না সে একটা কাঠি ছুঁয়েছে অমনি কাঠিটা ছিটকে গিয়ে খপ করে দড়ির ফাঁস লেগে গেল তার এক পায়ে।

ভড়কে গিয়ে কাকটা দড়িসমেত উড়ে পালাতে গেল। কিন্তু পারল না। কারণ দড়ির এক ধার ছিল ঘরের ভিতরে দুবরাজের হাতে। বরং টান পড়ে ফাঁস আরও জোরে চেপে ধরল তার পা। তখন দুবরাজ ছুটে এসে শক্ত করে দড়ির গিঁট বেঁধে দিল কাকটার পায়ে। তারপর বারান্দার রেলিংয়ে দড়িটা বেঁধে ঝুলিয়ে দিল তাকে।

তখন কাকটার যা দুর্দশা।

সে একবার করে পরিত্রাহি ডানা ঝাপটে উড়ে পালাবার চেষ্টা করে। অমনি দড়িতে আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঝুলতে থাকে আর ঝটপট করে।

তার চিৎকার শুনে যত রাজ্যের কাক এসে জুটল সেখানে। তারা আকাশ ছেয়ে পাক খেতে লাগল নুকাইদের বাড়ির ওপরে। আর কী তাদের চেঁচানি। কানে তালা ধরে যাবার যোগাড়।

এর পর আশপাশের সব বাড়ির ছাদে, আলসেতে কয়েক শো কাক বসে গেল সার-সার। তারা গোল-গোল চোখে বন্দী কাকটাকে দেখছে। খুব ডাকাডাকি করছে। যেন কোনও উপায় বের করতে পরামর্শ করছে ধরাপড়া সঙ্গীকে ছাড়াতে। কিন্তু তারা কিছু সুবিধে করতে পারল না।

ঘণ্টা-দুই পর বন্দী কাকটা নেতিয়ে পরল। সে আর ডাকে না ওড়ে না, চোখ বুজে ঝুলছে।

নুকাইয়ের মা বললেন, "ওকে এবার ছেড়ে দাও বাপু, নইলে মরে-টরে যাবে।"

তাই চাইছিল অবশ্য দুবরাজ। ঝুমঝুমিদিদির মুড়ি কেড়ে নেয়, এত বড় আস্পর্দা! তবে উচিত শিক্ষা পেয়েছে। এবার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। দড়ি টেনে তুলে খুলে দিল তার পা।

কাকটা খানিক থুম্ মেরে বসে রইল বারান্দায়। যেন তার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না যে, সত্যি ছাড়া পেয়েছে। তারপর চমকে উঠে ডানা ঝাপটে উড়ে পালাল।

তবে বেশি দূর যেতে পারল না। বারকয়েক টাল খেয়ে গিয়ে বসল সামনে এক নিচু ছাদে।

যেই না বন্দী কাক ছাড়া পেয়ে উড়ছে, অমনি অন্য কাকেরা আকাশ ফাটিয়ে ডাক দিতে-দিতে ঘুরপাক খেয়ে উড়তে লাগল। পরে তারাও গিয়ে বসল ওই ছাদে।

কিন্তু ফাঁদে-পড়া কাকের পাশে বসল না কেউ। ফাঁদে-পড়া কাকটা যে-রেলিংয়ে বসে ছিল, অন্য কাকরা সেটাকে বাদ দিয়ে অন্য তিন দিকের রেলিংয়ে বসল।

কাকেরা কা কা কঃ কঃ বলে নিজেদের ভিতর খুব বকবক করতে লাগল। যেন জোর এক মিটিং চলছে। তারা এ-ওর দিকে ঘাড় ঘোরায়, গলা ফুলিয়ে তর্ক করে। শুধু ফাঁদে পড়া কাকটা চুপ; মিটমিট করে সে সব দেখছে।

এর পর যা হল, দেখে তো নুকাইরা থ।

মীটিংয়ের কাকেরা এক-এক করে উড়ে যায় আর ফাঁদে-পড়াটার গায়ে-মাথায় প্রত্যেকে এক ঠোক্কর মেরে ফিরে আসে। ফাঁদে-পড়া পালাতে চেষ্টা করল না। বাধা দিল না। কেবল মার খেয়ে কোঁঃ করে কাতরে ওঠে।

নুকাইয়ের মা বললেন, "ওরা ওকে বিচার করে শাস্তি দিচ্ছে।"

"কেন?" নুকাই জানতে চায়।

"ওই যে ফাঁদে পড়েছিল, তাই। ওরা বোধহয় বলছে ওকে, তুই কাকেদের নাম ডোবালি। আমাদের জাতের লোক হয়ে কিনা মানুষের হাতে ধরা পড়লি! আহা, দেখছ, কাকটার পালক-টালক সব খুবলে নিল গো।"

অন্তত গোটা-পঁচিশ ঠোক্করের পর আসামির দণ্ড মকুব হল। তখন কাকেরা হৈ-হৈ করে উড়ে গেল সেই ছাদ ছেড়ে। ফাঁদে-পড়াও তাদের পিছু নিল।

আর কোনও দিন কোনও কাক নুকাইদের বারান্দা থেকে কিছু চুরি করতে আসেনি।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করেছে যে, বিশ্ব থেকে সংক্রামক ব্যাধি গুটি-বসন্ত সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে। আর কেউ টিকা নেবে না। আজ এসো, সবাই মিলে স্মরণ করি একটি নাম—এডোয়ার্ড জেনার। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে ইংল্যাণ্ডের ডক্টর জেনার বসন্তের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তাই আজ আমরা এই সাংঘাতিক রোগের হাত থেকে রেহাই পেলাম। টিকাকে ইংরেজিতে বলে ভ্যাকসিনেশন। রাশিয়ার যে-শিশুটিকে সর্বপ্রথম টিকা দেওয়া হয়, তার নামই রাখা হয়েছিল ভ্যাকসিনভ। আমাদের দেশের যে-শিশুকে সর্বশেষ টিকাটি দেওয়া হল, তার নাম কী, কে জানে।

শিশিরকুমার বসু

(২৬)

১৯৩৭-এর মাঝামাঝি থেকেই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে, রাঙাকাকাবাবু সম্ভবত ১৯৩৮-এ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হবেন। অকটোবরে জওহরলালের সভাপতিত্বে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের পর এবং গান্ধীজি কলকাতায় ঘুরে যাবার পর গুজবটা জোরদার হল। রাঙাকাকাবাবু সেই সময় ইউরোপে ও দেশের কোনো কোনো বন্ধুর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে এই মর্মে আভাষ দিচ্ছিলেন। সেকালে কংগ্রেসের সভাপতির পদের গুরুত্ব আজকালকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত । কংগ্রেসের সভাপতিকে তখন 'রাষ্ট্রপতি' বলা হত। স্বাধীনতাকামী কোটি-কোটি ভারতবাসীর কাছে তিনিই হতেন আমাদের জাতীয়তার প্রতিভূ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। ভারতের বাইরেও ভারতপ্রেমী বিদেশী বন্ধুদের কাছে এর গুরুত্ব কম ছিল না। পুরনো চিঠিপত্র দেখছি, রাঙাকাকাবাবু কংগ্রেসের প্রধান হবার সম্ভাবনায় তাঁরা খুবই আনন্দিত হচ্ছেন। এটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৭ সালের শেষে রাঙাকাকাবাবু অল্প সময়ের জন্য হলেও ইউরোপ সফরে যান।

ঐ ইউরোপ ভ্রমণ মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য হলেও নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, রাঙাকাকাবাবু নিজের চোখে ইউরোপের রাজনীতির চেহারাটা একবার দেখে নিলেন। দ্বিতীয়ত, ইউরোপে ও পরে ইংল্যাণ্ডে বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। তৃতীয়ত, ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই তিনি আত্মজীবনী লেখার পরিকল্পনা করছিলেন। ইংল্যাণ্ডের এক নামকরা প্রকাশন-সংস্থার সঙ্গে বই প্রকাশ করার চুক্তির মূল কপি আমাদের কাছে রয়েছে। তাতে দেখছি, প্রকাশক আত্মজীবনীর সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ১৯৩৭-এর নভেম্বরের মধ্যে চাইছেন। নানা কাজের মধ্যে যে রাঙাকাকাবাবু চুক্তি অনুযায়ী লেখা শেষ করতে পারেননি তা তো বোঝাই যাচ্ছে।

ঝড়ের মতো যাঁদের জীবনের গতি, লেখালেখির কাজ ভাল করে করতে হলে দেখছি হয় তাঁদের জেলে যেতে হয়, নয়তো নির্বাসনে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত যদি রাঙাকাকাবাবু ইউরোপে নির্বাসনে না থাকতেন, তাহলে 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' লেখা হত কিনা সন্দেহ। কী হুড়োহুড়ির মধ্যে তিনি লেখার কাজ করতেন, তার দুটো বড় দৃষ্টান্ত দিতে পারি। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ রাঙাকাকাবাবু দুদিনের মধ্যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটানা লিখেছিলেন। দৃশ্যটি মনে আছে। তিনি এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর ঘরে বসে পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। দু-এক পাতা লেখা হলেই একজন দৌড়ে সেটা উডবার্ন পার্কের বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে। উডবার্ন পার্কে টাইপ করা হচ্ছে, টাইপ করা হলে বাবার সেক্রেটারি নীরদ চৌধুরী মহাশয় সেটা মিলিয়ে দেখে দিচ্ছেন। তারপর আর-একজন দৌড়ে সেটা প্রেসে পৌঁছে দিচ্ছে। হরিপুরার পথে রওনা হবার ঘণ্টাখানেক আগে পর্যন্ত রাঙাকাকাবাবু তাঁর ভাষণ লিখছিলেন। নিজে ফিরে একবার পড়বার বা শোধরাবার কোনো সময় তিনি পাননি। তাঁর সঙ্গে ভাষণের ছাপা কপি দেওয়া সম্ভব হয়নি। সারা রাত এবং পরের দিন পুরোদমে প্রেসের কাজ চালিয়ে, বই বাঁধিয়ে পরের দিন রাতের ট্রেনে পাঠানো হয়। আজাদ হিন্দ সরকারের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রটিও রাঙাকাকাবাবু সিঙ্গাপুরে একটা পুরো রাত জেগে লিখেছিলেন। ২১ শে অকটোবর সরকার ঘোষণা হবে, কিন্তু ১৯ শে পর্যন্ত ঘোষণাপত্রটি লেখা হয়নি। ১৯ শে রাত বারোটায় শুরু করে ২০ শে ভোর ছটা পর্যন্ত কালো কফিতে চুমুক দিতে-দিতে একটানা লিখে গেলেন। দু-একখানা পাতা লেখা হচ্ছে, আর আবিদ হাসান বা এন·জি· স্বামী পাশের

ঘরে এস্.এ. আয়ারের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন। আয়ার টাইপ করে চলেছেন। টাইপ করা হবার পর বিন্দু-বিসর্গও বদলাতে হয়নি। যেমন আমরা দেখেছিলাম হরিপুরা ভাষণের বেলায়। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে দুটি অতি মূল্যবান ও স্মরণীয় দলিল এই ভাবে ঝড়ের বেগে লেখা হয়েছিল।

আত্মজীবনী তো একরাতে লেখা যায় না। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরের ইউরোপ যাত্রায় তিনি প্রথমেই গেলেন অস্ট্রিয়ায় তাঁর প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস বাদগাস্টাইনে। সেখানে শ্রীমতী এমিলিয়ের সাহায্যে দিন দশেক ইংরাজিতে আত্মজীবনীর দশটি পরিচ্ছেদ লিখলেন। জন্ম থেকে আই.সি.এস থেকে পদত্যাগ পর্যন্ত তিনটি খাতায় লেখা হল। এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, রাঙাকাকাবাবুর গুরুত্বপূর্ণ অনেক চিঠি বা প্রবন্ধ পেনসিলে লেখা, এটিও তাই। সেজন্য সংরক্ষণের কাজে নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

আত্মজীবনীতে রাঙাকাকাবাবু বসুবাড়ির সাতাশ পুরুষ পর্যন্ত পারিবারিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এর আগে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষ ও তাঁদের জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য

At School [illegible]

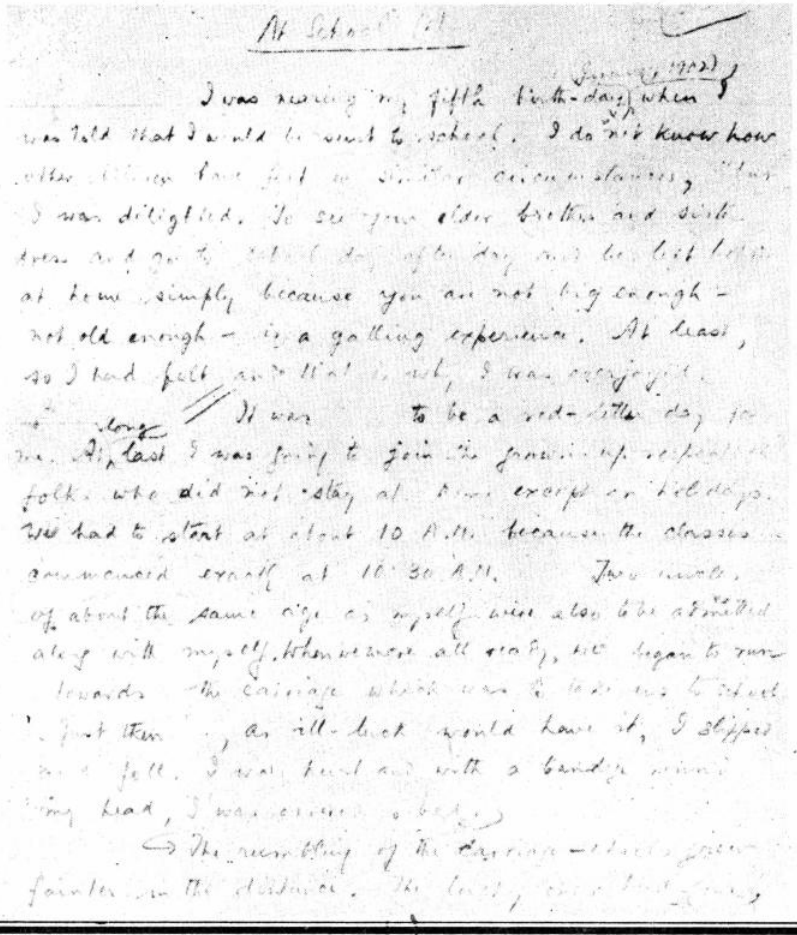

I was nearing my fifth birth-day when I
was told that I would be sent to school. I do not know how
other children have felt in similar circumstances, [illegible]
I was delighted. To see your elder brothers and sisters
dress and go to school day after day and be left behind
at home simply because you are not big enough –
not old enough – is a galling experience. At least,
so I had felt and that is why I was overjoyed.
It was to be a red-letter day for
me. At long last I was going to join the grown-up respectable
folks who did not stay at home except on holidays.
We had to start at about 10 A.M. because the classes
commenced exactly at 10.30 A.M. Two [illegible],
of about the same age as myself, were also to be admitted
along with myself. When we were all ready, we began to run
towards the carriage which was to take us to school
. Just then, as ill-luck would have it, I slipped
and fell. I was hurt and with a bandage round
my head, I was carried to bed.
The rumbling of the carriage – which grew
fainter in the distance. [illegible]

আত্মজীবনীর মূল পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

সুভাষচন্দ্র ও এমিলিয়ে।বাদগাস্টাইন(১৯৩৭)

প্রকাশ করিনি। জানতামও খুব কম। আমাদের গোষ্ঠীর বা পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দশরথ বসু। তাঁর চার পুরুষ পরে মুক্তি বসু কলকাতার চোদ্দ মাইল দক্ষিণে মাহীনগর গ্রামে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। সেই থেকে আমরা মাহীনগরের বসু-পরিবার বলে খ্যাত। দশরথের এগারো পুরুষ পর থেকে বসু-পরিবার জনজীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মহীপতি বসু সেই সময় বাংলার অর্থ ও যুদ্ধমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মহীপতির নাতি গোপীনাথ আরও এগিয়ে যান এবং তৎকালীন বাংলার অধিপতি সুলতান হুসেন শাহের অর্থমন্ত্রী ও নৌসেনাপতি নিযুক্ত হন। সুলতান তাঁকে 'পুরন্দর খাঁ' উপাধি দেন এবং মাহীনগরের কাছেই পুরন্দরপুর বলে যে একটা গ্রাম আছে সেটা তাঁরই জায়গির। পুরন্দরের বাগানই এখন হয়েছে মালঞ্চ গ্রাম। এই মালঞ্চে দাদাভাইয়ের বেশ একটা প্রকাণ্ড বাগান ছিল। পুজোর সময় ছেলেবেলায় আমরা যখন দল বেঁধে দেশে যেতাম, সেই সময় রাঙাকাকাবাবুকে এই বাগানের পুকুরে সাঁতার কাটতে দেখেছি।

দুশো বছর আগে মাহীনগরের কাছ দিয়েই হুগলী নদী বইত। কিন্তু নদীর গতি ধীরে-ধীরে সরে যাওয়ায় মাহীনগর ও আশপাশের গ্রামগুলিতে মহামারী দেখা দেয় এবং গ্রামবাসীরা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েন। বসুবাড়ির একটি শাখা পুরন্দরের বংশধরেরা কাছেই কোদালিয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। আমরা কোদালিয়াকেই আমাদের গ্রাম বলে জেনে এসেছি। গ্রামের নামের বেশ একটা ইতিহাস আছে। পুরন্দর বা গোপীনাথ বসু প্রগতিবাদী ছিলেন। জাত, কুল ইত্যাদি সম্বন্ধে সামাজিক নিয়ম ও বিধিগুলি পরিবর্তন করার জন্য তিনি এক বিরাট সম্মেলন ডেকেছিলেন, যাতে নাকি এক লক্ষেরও বেশি লোক যোগ দিয়েছিলেন। ঐ বিরাট সমাবেশে জল সরবরাহের জন্য অনেক লোক লাগিয়ে তিনি লম্বা একটা পুকুর বা খাল কাটিয়েছিলেন। কাজের পর মজুরেরা তাদের কোদালগুলি যেখানে জড় করে রাখতেন, সেখানেই কোদালিয়া গ্রামটি গড়ে ওঠে।

যাই হোক, রাঙাকাকাবাবু তাঁর আত্মজীবনী সম্পূর্ণ করবার সময় পেলেন না, এবং লণ্ডন থেকে বই প্রকাশের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ১৯৩৮-এর জানুয়ারি প্রথমে তিনি লণ্ডনে পৌঁছলেন। সেখানেই খবর পেলেন যে, তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। লণ্ডনে দেশী বিদেশী বহু লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনা হয়। বেশ কয়েকটি সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। একটি সভায় বন্ধুভাবাপন্ন ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতৃস্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। রাঙাকাকাবাবু তাঁদের স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ইংল্যাণ্ডের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো সাহায্য তিনি প্রত্যাশা করেন না, লড়াই করেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করব। সেই সময় কোনো কূটনৈতিক আলোচনার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতা ডি· ভ্যালেরা লণ্ডনে ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও রাঙাকাকাবাবুর দেখা হয়। ফেরার পথে ইটালির রাষ্ট্রনায়ক মুসোলিনির সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ইউরোপ রওনা হবার সময় বসু-বাড়ির একটা বিরাট দল দমদম বিমান-ঘাঁটিতে তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়েছিল। মাসখানেক পরে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে তিনি যেদিন ফিরলেন, সেদিন দমদমে খুব ভিড়। তাঁকে দেখে মনে হল, অল্পদিনের ঐ ইউরোপ সফরে তাঁর স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়েছে—সবল, সুঠাম দেহ, গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। (ক্রমশ)

বানানের ছড়া

দেব সেনাপতি

ঈ

সে এক প্রবীণ ব্রহ্মদৈত্য অতীব প্রাচীন অশথ গাছে,
উপবীতধারী উদাসী নীরব, প্রতীক্ষা করে একাকী আছে।
ভয়ে বশীভূত নয় সে, স্বাধীন, কভু কেউ গেলে ধারে বা কাছে,
ভাল-মন্দের মীমাংসা নেই, ঘাড় মটকিয়ে পা তুলে নাচে।

ঈঈ

ভাগীরথী-জল পান, হরীতকী ভক্ষণ
মনীষীরা সমীচীন বললেও বাছাধন
কোরো না, কারণ সেটা পাগলের লক্ষণ।

ইঈ

নিশীথে নির্ভীক হয়ে নিরীহ গর্দভ সুর ভাঁজে,
যশের কিরীট তাকে পেতে হবে গায়ক-সমাজে।
হেথা কোথা শ্রোতা? শুধু নিরীক্ষণ করে মাঝে-মাঝে
পৃথিবী বিদীর্ণ তার অদ্বিতীয় কণ্ঠের আওয়াজে।

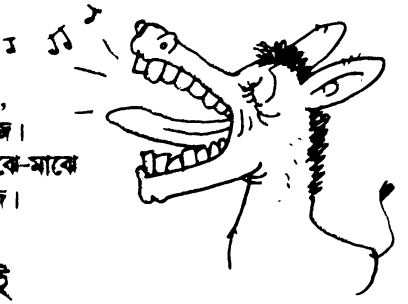

ঈই

জীবিকা জোটে না, মেলে শারীরিক কষ্ট।
মরুর খেজুর-বীথি! মরীচিকা স্পষ্ট।
যার কাছে হাত পাতে, সে-ই বলে, "কেষ্টা,
দধীচির আশ্রম নয় এই দেশটা।"
কেষ্টা দস্যু হল শেষে পেট চালাতে
বীণাপাণি অপেরার 'বাল্মীকি'-পালাতে।

ইঈই

অর্ধ-নিমীলিত চোখে দেখি পিপীলিকা
নাক নিপীড়িত করে, এ কী বিভীষিকা!

ছবি দেবাশিস দেব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব**

অগ্নিকাণ্ড চিত্রনাট্য ঃ তরুণ মজুমদার
ছবি ঃ বিমল দাশ

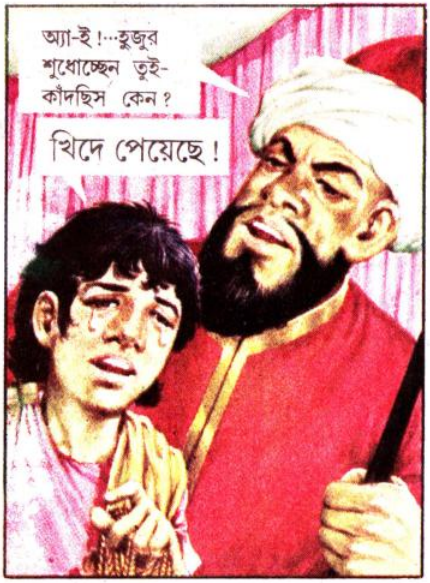

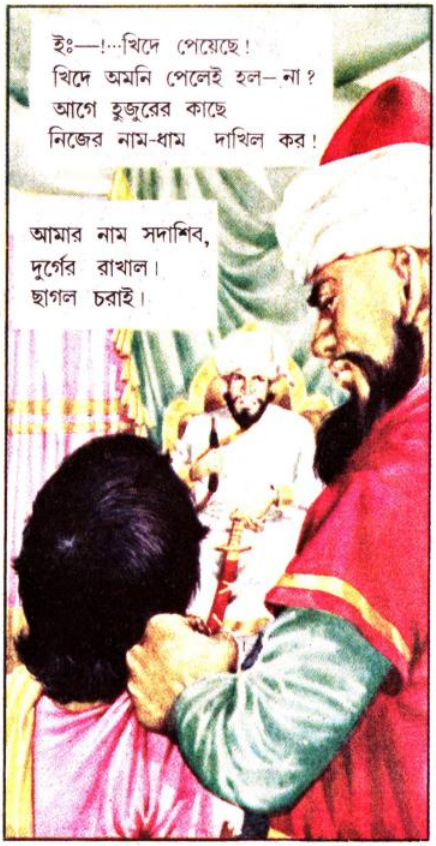

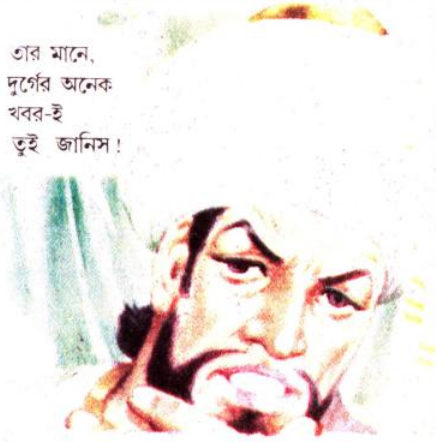

আজ্ঞে না। সাতসকালে ছাগল নিয়ে বেরিয়ে যাই—সন্ধেবেলা ফিরি। তখন ভীষণ খিদে পায় তো—তাই খেয়েদেয়েই ঘুমিয়ে পড়ি।

খিদে পেয়েছে !

তবে আজ ফিরিসনি কেন ?

ফিরছিলুম—এমন সময় তোমরা এসে পড়লে। ঘাবড়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লুম।

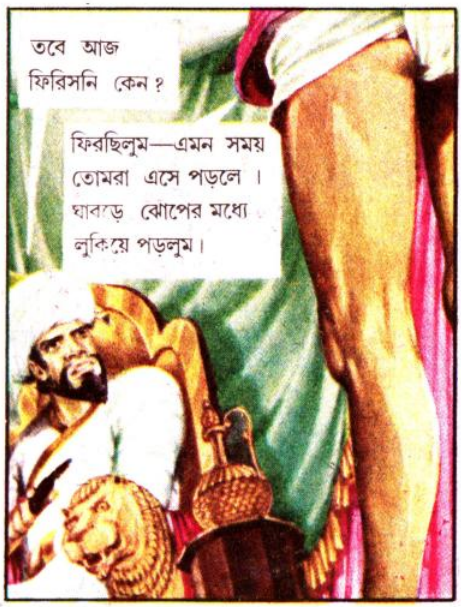

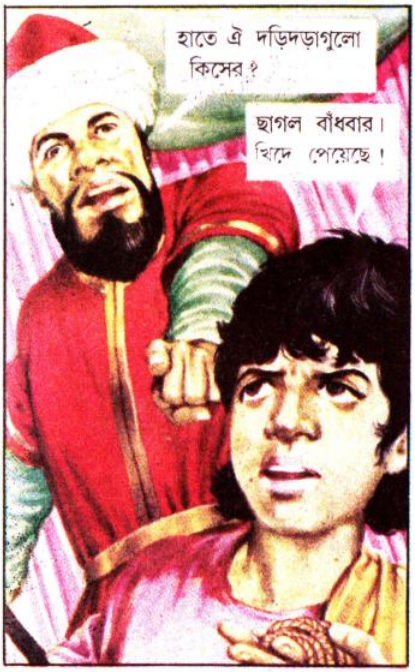

হাতে ঐ দড়িদড়াগুলো কিসের ?

ছাগল বাঁধবার। খিদে পেয়েছে !

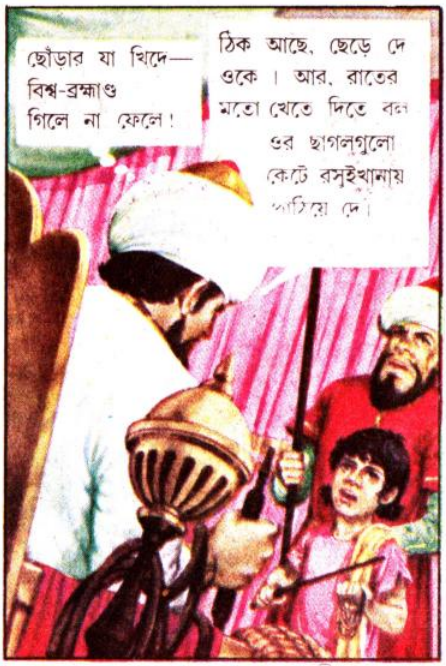

ছোঁড়ার যা খিদে—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড গিলে না ফেলে !

ঠিক আছে, ছেড়ে দে ওকে। আর, রাতের মতো খেতে দিতে বল ওর ছাগলগুলো কেটে রসুইখানায় পাঠিয়ে দে।

এর পরে আগামী সংখ্যায়

রোভার্সের রয়
অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রতীরে প্র্যাকটিস করছে রোভার্স টীম। রয় শূট করেছে…
গোল!
চার্লি ঠেকাতে পারেনি।
হঠাৎ…
পালাও!
কী ব্যাপার?
সবাই উঠে আসছে কেন?
বিপদের পতাকা উড়ছে…
তার মানে হাঙর দেখা গেছে!
বাব্বাবা!
কে চিৎকার করে উঠল!
হাঙর! হাঙর!
বাঁচাও!
ছেলেটা জলে!
ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে!
কে বাঁচাবে ওকে?
আমি বাঁচাব!
বাচ্চা ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিল রয়…
হাঙরটা ওদের দিকেই আসছে!
আরে!
চলে এসো রয়!
নাঃ, পারবে না!
সর্বনাশ!

হঠাৎ···
দেখি, লাগে কি না!
চার্লির নিশানা নির্ভুল!
ঠিক লেগেছে!
তারপর···
উঠে এসেছে!
রয়!
ধন্যবাদ চার্লি!
হাঙরটা পালাচ্ছে!
ছেলেটির বাবা অভিভূত····
আপনিই বাঁচিয়েছেন!
ভদ্রলোক জানেন না যে, রয়···
শুধু ছেলের রক্ষাকর্তা
আমার কার্ড রাখুন···
রেখে দাও!
আমি আমার কর্তব্য করেছি
ROY
হোটেলে ফিরে···
যাক, তোমার শরীর মনে হয় ভালই আছে!
মনে তো হচ্ছে!
কাল ভারাণ্টোর সঙ্গে খেলা।
মাঠে প্রচুর লোক···
রোভার্স পুরো শক্তিতে মাঠে নেমেছে!
দেখা যাক কী হয়!
ROVERS
ভার্নন বল দিয়েছে রয়কে!
মারো, রয়!
রয় মারল··· কিন্তু···
যাঃ!
এ কী করল!
শরীর ভাল নেই নাকি?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

ভীষণ ঝড়জল!
যা বলেছ! হাহা!
মানিকজোড়কে দেখেছ?
অনেকক্ষণ থেকেই তারা বেপাত্তা!

জনসন! রনসন!
জলে পড়ে গেল নাকি!
জাহাজডুবির আগে তুমিও এসো, মেট!

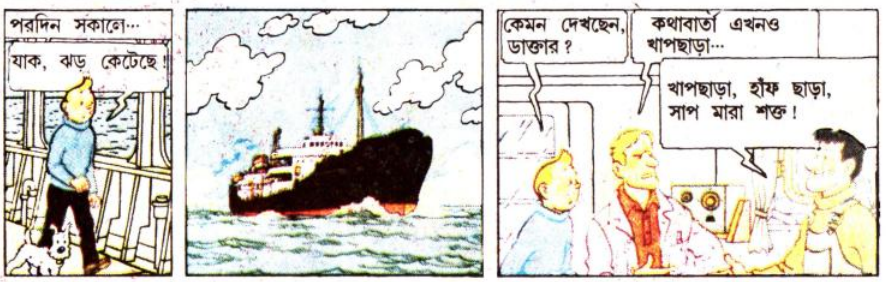
পরদিন সকালে...
যাক, ঝড় কেটেছে!
কেমন দেখছেন, ডাক্তার?
কথাবার্তা এখনও খাপছাড়া...
খাপছাড়া, হাঁফ ছাড়া, সাপ মারা শক্ত!

নাঃ, ওর কাছে কিছু জানা যাবে না!
দিন কয়েক বাদে...
ওই তো খেমিখল!
পুলিশের লঞ্চ আসছে!

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কড়াকড়ি স্বাভাবিক...
আমরা পুলিশ, জাহাজ তল্লাশ করব।
বেশ তো।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শব্দ-সন্ধান

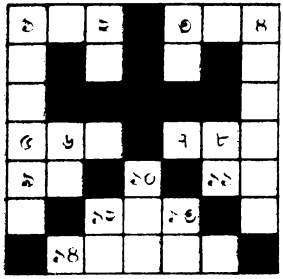

সংকেত : পাশাপাশি : (১) সিঁড়ি। (৩) আক্ষরিক অর্থে জলে জাত, বিশেষ অর্থে পদ্ম। (৫) পৃথিবী। (৭) অমঙ্গল। (৯) ভার। (১১) ক্রমিয় পথ্য। (১২) যে বহন করে। (১৪) যে-চিনি ঝাল।

উপর-নীচ : (১) বিখ্যাত সংস্কৃত-গ্রন্থকার। (২) পয়গম্বর। (৩) যে-মুনির নাম থেকে গঙ্গার আর-এক নাম। (৪) কোন্ জেলার মধ্যে একটি ফলের নাম রয়েছে? (৬) দেবতা। (৮) একটি রাজধানী শহর। (১০) যুদ্ধ। (১২) পিতা। (১৩) নবজাত।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ডা	ন	পি	টে		শ	ক্ষ
ল		পা	নি	ফ	ল	
কু	হু		স		ভ	
ম্ভা						কু
	নো		অ		ত	রু
	ল	ল	ম্ভি	কা		বি
ডা	ক		ম	ক	র	ন্দ

ধাঁধা

"আয় একটা মজা করি।" ছোটকা বলল, "চটপট, চটপট; গৌরী আসছে ওপরে।"

গৌরী আমার মামাতো বোন। কলেজের শেষ পরীক্ষা দিয়ে ছুটি কাটাচ্ছে মনের সুখে। এখানে ঘুরছে, সেখানে যাচ্ছে। কী মজায় সে রয়েছে, ভাবা যায় না। সেই গৌরীকে নিয়ে আবার নতুন করে কী মজা করবে ছোটকা, আমার মাথায় খেলে না।

ছোটকার মাথায় কখন যে কী খেয়াল চাপে তা অবশ্য বোঝা শক্ত। গৌরীকে ওপরে আসতে দেখেই ছোটকার মাথায় নিশ্চিত কিছু বুদ্ধি খেলে গেছে।

আমি ছোটকার দিকে তাকাই। ছোটকা চটপট কয়েকটা টাকা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিল, শার্টের পকেটে কত টাকা ঠিক দিল যে ছোটকা, টের পেলাম না। নিজের মানিব্যাগ থেকে আবার কিছু টাকা গুনে নিল ছোটকা, সেটাও কত, ঠাহর হল না। ছোটকা নিজের জামার বুকপকেটে রেখে দিল টাকাগুলো।

গৌরী ঘরে ঢুকে পড়েছে ততক্ষণে। ছোটকার হাবভাব দেখে কী বুঝল কে জানে। বলল, "তুমি কি বেরুচ্ছ কোথাও?"

ছোটকার বলল, "বেরুচ্ছি না। তবে বেরুব। তোর জন্য সিনেমার টিকিট কিনে আনব। তবে একটা শর্ত রয়েছে।"

"শর্ত মানে?" গৌরী প্রশ্ন করল অবাক হয়ে। ছোটকা বলল, "কিছুই না। একটা ছোট্ট ধাঁধার উত্তর দিতে হবে। পারলেই সিনেমা।" একটু থেমে মজার মুখ করে ছোটকা বলল, "না-পারলেও সিনেমা।"

গৌরীর মুখে হাসি ফুটল। বলল, "তাহলে বলো।"

ছোটকা বলল, "আমার পকেটে কিছু টাকা রয়েছে, সতুর পকেটেও রয়েছে কিছু। ও যদি ওর পকেট থেকে আমায় একটা টাকা দেয়, তাহলে ওর আর আমার টাকা হবে সমান-সমান। আর তা না করে, আমি যদি ওকে একটা টাকা দিই সেক্ষেত্রে ওর টাকা হবে আমার পকেটের তখনকার টাকার দ্বিগুণ। এবার বল, ওর পকেটে কত টাকা, আমার পকেটেই বা কত টাকা রয়েছে এখন।"

ছোটকার ধাঁধাটা গৌরী চেষ্টা করুক। আমরাও এসো উত্তর খুঁজি। এটাই প্রথম ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা॥ বনগাঁয় থাকেন রসুল মিঞা নামের এক বুড়ো দর্জি। তাঁকে কি যশোরে কবর দেওয়া যাবে?

তৃতীয় ধাঁধা॥ শব্দটার জট ছাড়াও —

ঝিচলগোম

গতবারের উত্তর॥ (১) অ্যালবামটির কেনা দাম পাঁচ টাকা, ফলে মনোজবাবুর আসল লোকসান দশ টাকা—যা লোকটিকে নগদ ফেরত দিয়েছেন এবং পাঁচ টাকা — যা অ্যালবামের কেনা দাম। আনন্দ ভাণ্ডার থেকে নেওয়া কুড়ি টাকা তো হিসেবে আসছে না। কেননা, সে-টাকা তো আনন্দ ভাণ্ডার থেকে আগেই নেওয়া। (২) বলা হয়েছে, একটি মুদ্রা সিকি নয়। অন্যটি সিকি হতে দোষ কী। একটি সিকি, একটি দশ পয়সা। (৩) এগারো শো লিখতে গেলেই বিপদ, লিখতে হবে বারো হাজার এক শো এগারো।

—সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

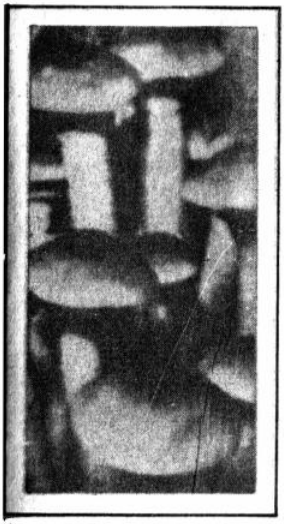

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ফাটানো ডিমের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ যাদের বাগানে লন নেই তারা কী কাপড়ের জামা পরে?
উঃ নাইলন-এর।

প্রঃ গান্ধার আর ধৈবত স্বর-দুটি কার গলায় ভাল খেলে?
উঃ গা-ধা-র।

প্রঃ শীতের সময় সবচাইতে আরাম কিসে?
উঃ কাঁথা মুড়ি দিয়ে আগুনের পাশে বসে নাম জপ করা, শীতারাম, শীতারাম।

প্রঃ গানের কোন্ তালের মালিক খুঁজে পাওয়া যায়নি?
উঃ কাহারবা।

—সুসেন

মজার খেলা

টেবিলের ওপর নীচের ছবির মতন দশটা দেশলাইকাঠি পরপর সাজিয়ে রাখো।

খেলাটা হল, কাঠি সরিয়ে সরিয়ে পাঁচ জোড়া কাঠি সাজিয়ে ফেলতে হবে, আর কাঠি সরাবার শর্ত হল এক দানে একটা কাঠি তুলে পরপর দুটো কাঠিকে ডিঙিয়ে পরের কাঠির পাশে বসাতে হবে। এই ভাবে পাঁচ দানে কাঠি সরে-সরে পাঁচ জোড়া থাকবে টেবিলে।

বন্ধু চেষ্টা করুক। তুমি ততক্ষণে নিজে শিখে নাও দানগুলো।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
। । । । । । । । । ।
(এভাবে প্রথমে থাকছে)
(১) ॥ । । × । । । । । । ।
(৪ এল ১-এর পাশে)
(২) ॥ । । × । × । । ॥ ।
(৬ গেল ৯-এর পাশে)
(৩) ॥ । ॥ × । × । × ॥ ।
(৮ এল ৩-এর পাশে)
(৪) ॥ × ॥ × ॥ × । × ॥ ।
(২ গেল ৫-এর পাশে)
(৫) ॥ × ॥ × ॥ × ॥ × ॥ ×
(১০ এল ৭-এর পাশে)

দেশলাইকাঠি টেবিলে সাজিয়ে নিয়ে ছবির মতো করে পাঁচটা দান দাও, তাহলেই স্পষ্ট হবে, কী মজার খেলা এটা।

—মজারু

হাসিখুশি

বক্তা : আপনি একা ধৈর্য ধরে আমার বক্তৃতা শুনছেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

শ্রোতা : আহা, আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? আপনার পরে তো আমিই বলব।

লেখক : আমার বইটা পড়েছেন, স্যার?

সমালোচক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, পড়েছি। কয়েক পাতা পড়ার পরেই আমি চমৎকার ঘুমিয়ে পড়ি।

রিঙ্কুকে মা বললেন, "দুপুরবেলায় একা-একা বাইরে বেরিও না। ছেলেধরা ধরে নিয়ে যাবে।"

মায়ের কথায় রিঙ্কু অবাক হয়ে বলল, "বা রে, আমাকে ধরবে কেন? আমি কি ছেলে নাকি? আমি তো মেয়ে।"

মাস্টারমশাই : মামাবাড়ির ইংরিজি কী, কে বলতে পারো?

হাত তুলে দাঁড়াল কুকুন। "আমি পারি স্যার। মাদার-মাদার'স হাউস।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

Campa
ক্যাম্পার সঙ্গে
আমরা মাতি রঙ্গে
স্বাদে ও আনন্দে!
Campa
CONTENTS 200 ML
OBM/5361

সেই ছবিটি

মা-বাবার সঙ্গে কিছুদিন আগে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানকার অনেক সুন্দর-সুন্দর জায়গার মধ্যে শ্রবণবেলগোলা একটি। উঁচু পাহাড়ের উপর ৬৮ ফুট লম্বা এক বিশাল নগ্ন মূর্তি। নাম গোমতেশ্বর। ৬০০ টি সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে পাহাড়ে উঠতে যে কী আনন্দ হয়েছিল বলে বোঝাতে পারব না।

জায়গাটা ছেড়ে আসতে খুব কষ্ট হয়েছিল। পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় দেখলাম, সূর্যের ঝলমলে আলো পড়েছে আকাশছোঁয়া মূর্তির চোখে-মুখে। অপূর্ব সে দৃশ্য!

বাবার হাতে-তোলা শ্রবণবেলগোলার অনেক ফোটোর মধ্যে আজও আমি সেদিনের সেই ছবিটি পরিষ্কার দেখতে পাই।

অনির্বাণ সরকার (বয়স ১০)

বসন্তকাল

শীতকাল শেষ হলে বসন্ত আসে। শীতের ঠাণ্ডাগরম-মেশানো পাখির কাকলিভরা দিনগুলি বড় ভাল লাগে।

শীতের সময় গাছপালা ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়, কিন্তু বসন্ত এলেই কচিপাতা আর ফুলে-ফুলে চারদিক ভরে ওঠে। রঙের মেলা বসে যায়। এই সময় শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব হয়।

বসন্তে কিছু ভয়ানক রোগও হয়। এই রোগগুলিকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মা আমাদের কয়েকটি অপছন্দের জিনিস খাওয়ান, যেমন কাঁচা হলুদ, নিমপাতা ইত্যাদি। তখন বসন্তকাল বড় বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

সুমেধা চক্রবর্তী (বয়স ৯)

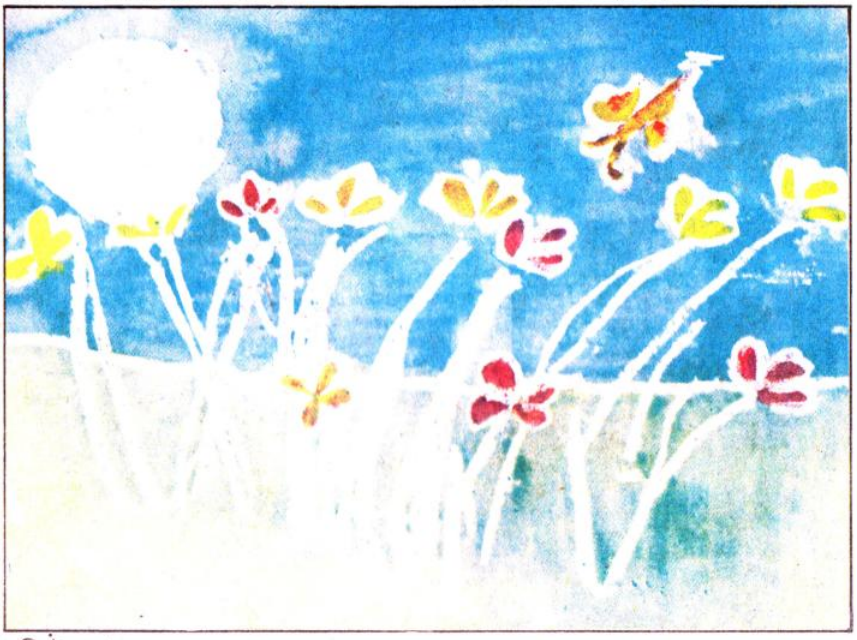

ছবি এঁকেছে অনসূয়া দত্ত (বয়স ৬)

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

বাবাইয়ের বাজার

বাবাই গেল করতে বাজার
সঙ্গে নিল টাকা হাজার,
এক পয়সার কিনল চাল
দু' পয়সার মুসুরডাল,
তিন পয়সার দই—
বাবাই এসে হিসেব করে
আর পয়সা কই?

অঞ্জন চক্রবর্তী (বয়স ৮)

ঝিলমিল

কিছুদিন আগে আমি আর বাবা লবণ হ্রদে 'ঝিলমিল' দেখতে গিয়েছিলাম। ওখানে ঢুকতে প্রত্যেকের পঞ্চাশ পয়সা লাগে। আমাদের মতো ছোটরা সেখানে আনন্দ ও হৈ-চৈ করার অনেক কিছু পাবে। প্রথমে আছে টয় ট্রেন। সত্যিকারের ছোট স্টেশন, নাম তার ঝিলমিল। পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কেটে চাপতে হল। তারপর কু-ঝিক-ঝিক। আধ ঘন্টা বাদে ট্রেনযাত্রা শেষ।

ট্রেন থেকে নেমে মিনি পাহাড়ে চড়লাম। পাহাড়ের ওপর থেকে সব কিছু ছোট ছোট লাগে। মনে হল, চল্লিশ একর জায়গা জুড়ে বিশাল একটা বাগান সাজানো হচ্ছে। নীচে নেমে দোকানে ঢুকে পেট ভরে খেলাম।

কিছু দূরে সর্পোদ্যান। ওখানে ঢুকতে লাগে মাথাপিছু ত্রিশ পয়সা। উদ্যানে ঘর এবং বাঁধানো গর্তের মধ্যে আছে অনেক বিষধর সাপ। দেখে ভয় পাই, আবার মজাও লাগে।

একটু দূরে আছে বিশাল এক তারের খাঁচা। এত বড় পক্ষিশালা নাকি ভূ-ভারতে আর নেই। কিন্তু ভো-কাট্টা! খাঁচার মধ্যে একটাও পাখি নেই। শুধু ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে পাখ-পাখালির মতো দৌড়োদৌড়ি করছে। আমিও করলাম। মনে হয়, সবে তৈরি হচ্ছে। নিশ্চয়ই একদিন বিরাট খাঁচার মধ্যে অসংখ্য পাখি আসবে।

সুসান চক্রবর্তী (বয়স ১২)

বৃষ্টির ছড়া

বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছে
মেঘ ডাকছে তো ডাকছে
শীতল বাতাস বইছে তো বইছে
শরীর কাঁপছে তো কাঁপছে
সর্দি হচ্ছে তো হচ্ছেই
অসুখ করছে তো করছেই
মুড়ি খাচ্ছি তো খাবই
মামারবাড়ি যাবই।

সঞ্জীব সেন (বয়স ১২)

ভয় শুধু খান

বস্তা দু'এক নাস্তা খেতে
ব্যস্ত আছেন খাস্তগির,
মস্ত শরীর চোস্ত বুলি
ধড়ের পরে ত্রস্ত শির।
মস্ত বড় হস্তী তিনি
হস্ত দিয়ে থামিয়ে দেন,
সূর্য যখন অস্ত যাবে
মধু খাবেন দুটি প্যান।
কালীমাতার ভক্ত তিনি
শরীরটি তাঁর শক্ত খুব,
ভয় শুধু খান মাকড়শাকে
নাম করলেই করেন চুপ।

সত্যেশ মুখোপাধ্যায় (বয়স ১৪)

সোনামেরা দিনের মধুর আবেশ
চিরকাল রাখে তার সুরভিত রেশ

যে সৌরভ আপনার মন মাতায়

HTM-PIL-2133

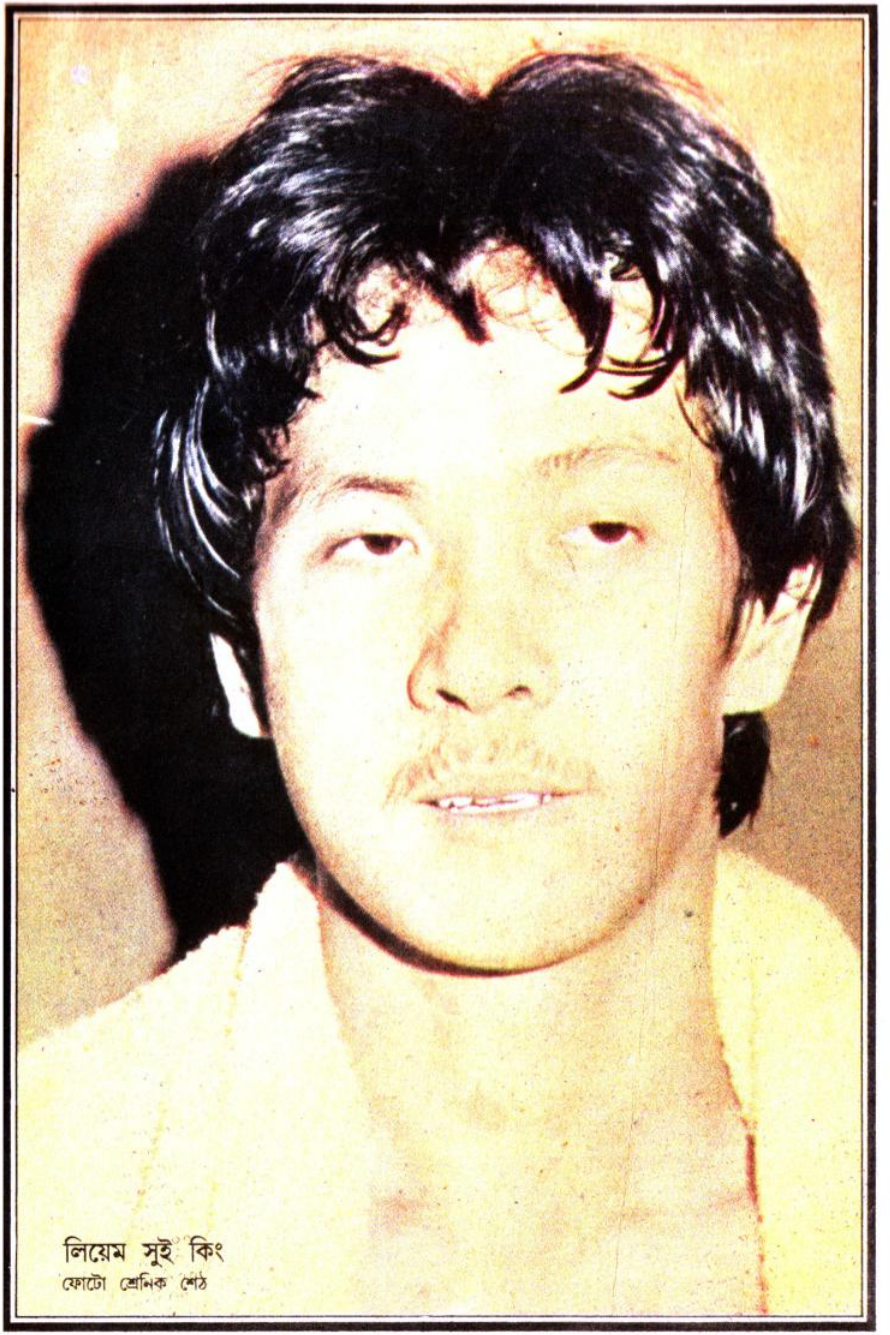

লিয়েম সুই কিং
ফোটো শ্রেনিক শেঠ

(পাতা ওলটাও)

কিং রাজা, প্রকাশ মন্ত্রী / অলোক দাশগুপ্ত

প্রায় এক বছর ধরে প্রকাশ পাড়ুকোনের ক্রমাগত ব্যর্থতা অনেকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, প্রকাশ বুঝি নেহাত ধূমকেতুর মতো হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে গেলেন। প্রকাশের বন্ধুবান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীরা আশা করেছিলেন তাঁর এই ব্যর্থতা সাময়িক। প্রকাশ ওঁদের মুখ রেখেছেন। এবারের অল-ইংল্যাণ্ড খেতাব জিততে পারেননি ঠিকই, ফাইনালে ১৫-১০, ৪-১৫, ৬-১৫ পয়েন্ট-এ হেরে গিয়েছেন ইন্দোনেশীয় লিয়েম সুই কিংয়ের কাছে; কিন্তু যেমন সাবলীলভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে একের পর এক বাধা ডিঙিয়ে তিনি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেছেন তাতে মনে হয়েছে আমরা বোধহয় এক বছর আগের প্রকাশকে আবার ফিরে পেয়েছি।

১৯৭৯-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৮০-র মার্চ নিঃসন্দেহে প্রকাশের খেলোয়াড় জীবনের সেরা সময়। লণ্ডনের ইভনিং অব চ্যাম্পিয়নস, মাসটার্স, ডেনিস এবং সুইডিশ ওপেন, প্রকাশ একের পর এক এই সব আন্তর্জাতিক টুর্নামেণ্টে জয়ী হয়েছেন। আর প্রথম ভারতীয় হিসেবে অল-ইংল্যাণ্ড খেতাব জেতা ছিল তো এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

এর আগে পর্যন্ত প্রকাশকে "কালো ঘোড়া", অর্থাৎ যে-সব খেলোয়াড় অঘটন ঘটাতে পারেন, তাঁদের একজন ভাবা হত। কিন্তু ওয়েম্বলির জয় প্রকাশকে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন বানিয়ে দিল। ভারতে ফিরে প্রকাশ পেলেন প্রায় রাজকীয় সম্বর্ধনা। মাত্র দেড়মাস পরে জাকার্তায় বসল দ্বিতীয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। অল-ইংল্যাণ্ড খেতাব জেতার পরের সময়টা প্রকাশকে এমন শারীরিক এবং মানসিক ধকলের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে যে, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য নিজেকে তিনি তেমনভাবে তৈরি করে নিতে পারেননি; ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন ইন্দোনেশীয় হাদিয়ান্তোর কাছে।

যে আত্মবিশ্বাস প্রকাশকে একজন চ্যালেঞ্জার হিসেবে সাফল্য এনে দিয়েছিল, প্রকাশ আস্তে-আস্তে তা হারিয়ে ফেললেন। কোর্টে পা দিলেই "বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন" হওয়ার মানসিক বোঝা ওঁকে পেয়ে বসত। নিজের স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারতেন না, কয়েকমাস আগেও যাঁদের অনায়াসে হারিয়েছেন তাঁদের কারো কারো কাছেও নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন। প্রকাশ মনে করছিলেন তিনি একটা 'ব্যাড প্যাচের' মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আসলে যে তাঁর আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি যে বাড়তি স্নায়ুর চাপে ভুগছেন তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না।

ইতিমধ্যে আশির শেষ দিকে উনি 'লাইসেন্সড প্লেয়ার' হলেন এবং এক বছরের জন্য ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে চলে গেলেন। নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা তো আছেই, তাছাড়া ওদেশে সমস্ত কাজ নিজেকেই করতে হয়। ভারতে প্রকাশ যে-রকম কড়া অনুশীলন করতেন, ডেনমার্কে প্রথম প্রথম সেই সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ফলে তাঁর ফিটনেসও কমে গিয়েছিল।

তারপর একাশির জানুয়ারিতে ঘটল সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের সম্রাট সিংহাসনচ্যুত হলেন বিজয়ওয়াড়া ন্যাশনালে। সৈয়দ মোদির কাছে এই হার প্রকাশের পক্ষে শাপে বর হয়েছিল। প্রকাশ বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন এবং নিজের খেলা খেলতে পারছেন না।

মনের জোর বাড়াবার জন্য এরপর প্রকাশ যোগের ক্লাসে যাতায়াত শুরু করেন। বাঙ্গালোর থেকে ছোট বোন পদ্মিনী উড়ে যান কোপেনহেগেনে প্রকাশের ঘর-সংসার দেখাশুনো করতে। অল-ইংল্যাণ্ডের জন্য নিজেকে ঠিকমতো প্রস্তুত রাখতে জার্মান ওপেন এবং সুইডিশ ওপেন থেকে প্রকাশ নাম প্রত্যাহার করেন। যেহেতু তিনি এখন ডেনমার্কের বাসিন্দা তাই ডেনিশ ওপেনে যোগ দেন এবং রুডি হরতনোকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠেন। হাঁটুর ব্যথায় বিব্রত না হলে ফাইনালে

প্রকাশের পক্ষে মর্টন ফ্রস্ট হ্যানসেনকে হারানো হয়তো অসম্ভব ছিল না।

ওয়েম্বলিতে শুরু থেকেই প্রকাশ ভাল খেলেছেন। প্রথম রাউণ্ডে ডেনমার্কের পল প্যাটারসনকে ১৫-৮, ১৫-৭ পয়েন্টে; দ্বিতীয় রাউণ্ডে আর-এক ডেন খেলোয়াড় ক্লডিস অ্যানডারসনকে ১৫-৭, ১৫-৫ পয়েন্টে এবং তৃতীয় রাউণ্ডে ইন্দোনেশিয়ার সুগিয়ারতোকে ১৫-৬, ১৫-১০ পয়েন্টে হারিয়ে তিনি চতুর্থ বাছাই লুই পঙ্গোর মুখোমুখি হন। এই পঙ্গোর কাছে গত ডিসেম্বরে টোকিওতে প্রকাশ হেরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ম্যাচে তাঁকে দাঁড়াতেই দিলেন না, মাত্র ৪৫০ মিনিটের মধ্যে জিতলেন স্ট্রেট গেমে, ১৫-৮, ১৫-৭ পয়েন্টে।

সেমিফাইনালে প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাডমিন্টনের প্রবাদপুরুষ রুডি হরতনো। সত্তর দশকের গোড়ায় এই হরতনোর খেলা সেদিনের কিশোর প্রকাশের মনে বড় খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন গড়ে তুলেছিল। রুডি এখন আর পুরোনো রুডি নেই। দম এবং শারীরিক পটুতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু যতক্ষণ দাপটের সঙ্গে খেলেন ততক্ষণ ওঁর মোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য।

কিন্তু প্রকাশ ছিলেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। গত এক বছরে যতবার তিনি হরতনোর মুখোমুখি হয়েছেন প্রত্যেকবারেই জিতেছেন। দারুণ স্ম্যাশে এবং দুর্দান্ত ব্যাক-হ্যাণ্ড মারে ২৫ বছরের প্রকাশকে বিপর্যস্ত করে ৩১ বছরের রুডি প্রথম গেম জেতেন ১৫-১০ পয়েন্টে। প্রকাশ জানতেন তাঁর 'গুরু'কে হারাতে হলে র‍্যালিগুলিকে লম্বা করিয়ে তাঁকে ক্লান্ত করে তুলতে হবে। দ্বিতীয় গেমের শুরু থেকে প্রকাশ সেই চেষ্টায় মনোযোগী হলেন এবং অভূতপূর্ব উত্তেজনার মধ্যে ১০-১৫, ১৫-৭, ১৫-৮ পয়েন্টে ম্যাচ জিতে নিলেন।

কিন্তু শীর্ষবাছাই লিয়েম সুই কিং বয়সে তরুণ এবং, নির্দ্বিধায় বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়। প্রকাশের সঙ্গে ফাইনাল ছিল তাঁর কাছে মর্যাদার লড়াই, কারণ গতবারে উনি প্রায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেরেছিলেন। শুরুতে সমর্থকদের করতালির মধ্যে কিং ৯-০ পয়েন্টে এগিয়ে যান। প্রকাশ পিছিয়ে পড়ে এগিয়ে যেতে ভালবাসেন। নিখুঁত প্লেসিং এবং ড্রপ শটে কিংকে পরাস্ত করে প্রথম গেম জিতলেন ১৫-১১ পয়েন্টে। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে ব্যাডমিন্টনের রাজা আবার গর্জে উঠলেন এবং প্রকাশকে কোনোরকম সুযোগ না দিয়ে তাঁর তৃতীয় অল-ইংল্যাণ্ড খেতাব জিতে নিলেন ৪৪ মিনিটের মধ্যে।

প্রকাশ ছাড়া অন্য ভারতীয়রা তেমন সুবিধে করতে পারেননি। পার্থ গাঙ্গুলি এবং সঞ্জয় শর্মা হেরেছেন দ্বিতীয় রাউণ্ডে। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন

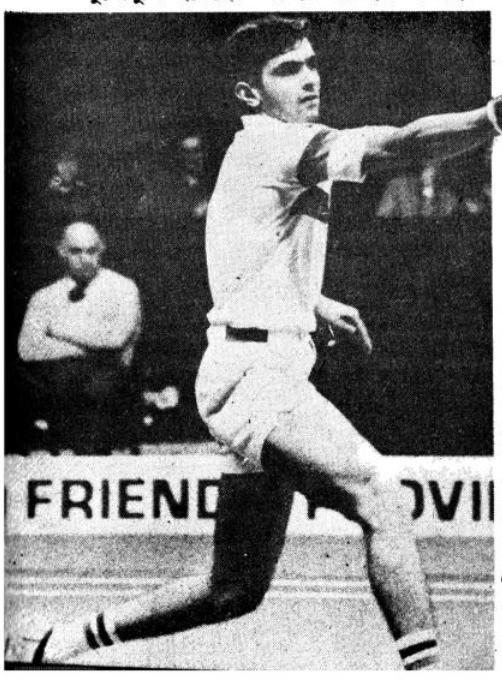

সৈয়দ মোদি এবং আমি ঘিয়া সহজেই তৃতীয় রাউণ্ডে পৌঁছোন, কিন্তু লিয়েম সুই কিং বা ইভানা লি-র বিরুদ্ধে যে ওঁরা সুবিধে করতে পারবেন না সেটা জানা ছিল। ৭১তম অল-ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের বিস্ময় দক্ষিণ কোরিয়ার উঠতি তারকা সুনাই হোয়াং। প্রথম আবির্ভাবে ওয়েম্বলিতে খেতাব জেতা যে-কোনো খেলোয়াড়ের পক্ষে কৃতিত্বের ব্যাপার, বিশেষ করে গত দুই বছরের চ্যাম্পিয়ন লেনে কোপেনের মতো অভিজ্ঞ মহিলা খেলোয়াড়কে মাত্র ২১ মিনিটের মধ্যে ১১-১, ১১-২ পয়েন্টে হারিয়ে। সুনাই এলেন, খেললেন, জয় করলেন।

অশোক মাঁকড়ের ম্যাচ / অভিমন্যু

ওয়াংখাড়ে স্টেডিয়ামের প্রেস-বক্সে বসে ছোট্ট একটি ছেলে আপনমনে স্কোর লিখছিল আর সাংবাদিকরা কিছু জানতে চাইলে অফিসিয়াল স্কোরারকে কোনোরকম সুযোগ না-দিয়েই চটপট উত্তর দিচ্ছিল। অন্য অনেকের মতো ছেলেটিকে আমি চিনতাম না। বোম্বাইয়ের এক সাংবাদিক বন্ধু জানালেন, "ও মিহির, অশোক মাঁকড়ের ছেলে।"

অশোক বোধহয় টের পেয়েছিলেন, স্কোর বুকে ধরে রাখার জন্য মিহির তাঁর কাছ থেকে বড় রান আশা করছে। দীর্ঘ ৫৭৩ মিনিট উইকেটে থেকে দর্শকদের করতালির মধ্যে দিয়ে ক্লান্ত অশোক মাঁকড় যখন প্যাভিলিয়নে ফিরে এলেন, তখন তাঁর নামের পাশে ২৬৫ রান লেখা হয়ে গেছে।

ক্রিকেট ২২ জনের খেলা। কিন্তু মাঝে-মাঝে একজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব অন্যদের কৃতিত্বকে ম্লান করে দেয়—এবারের রণজি ট্রফি ফাইনালে অশোক মাঁকড়ের ২৬৫ এমনি এক অসাধারণ ইনিংস।

অশোক যখন ক্রীজে এলেন, বোম্বাইয়ের অবস্থা তখন মোটেই ভাল নয়, মাত্র ২২ রানের মধ্যে রামনাথ পারকার এবং গুরু গুপ্তে আউট হয়ে গেছেন। সুনীল ভালসনের বলে স্কোয়ার ড্রাইভ মেরে অশোক জানিয়ে দিলেন, এই ম্যাচে তিনি দারুণ ব্যাট করবেন। ওয়ানখাড়ে স্টেডিয়ামের প্রায় পনরো-কুড়ি হাজার দর্শক দুদিন ধরে উপভোগ করলেন চোস্ত ড্রাইভ, কাট এবং পুল। অনেকের ধারণা, বাম্পার বোলিংয়ের মোকাবিলায় অশোক মাঁকড় তেমন পটু নন। এই তো সেদিন বরুণ বর্মনের একটু ঠুকে-দেওয়া বলে ঠকে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু রণজি ফাইনালে তাঁকে অন্য মূর্তিতে দেখা গেল। মদনলাল এবং ভালসনের বাম্পারগুলিকে অযথা সমীহ না করে বাউণ্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

এটি রণজি ট্রফিতে অশোক মাঁকড়ের ১৮তম সেনচুরি এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান। তাই কিছুটা অবাক হলাম যখন অশোক বললেন, "এই ম্যাচে আমি মোটামুটি ভাল ব্যাট করলেও আমার সেরা ইনিংস ১৯৭৬-এ হায়দারাবাদের বিরুদ্ধে। আমরা প্রথম ইনিংসে ৮৭ রানে পিছিয়ে ছিলাম। প্রথম বলেই আমি আউট হতে-হতে বেঁচে যাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৩৫ রানে অপরাজিত থাকি। জয়ের জন্য হায়দারাবাদের প্রয়োজন ছিল ২১৬, কিন্তু মাত্র ১০১ রানে ওঁরা আউট হয়ে যায়। চরম উত্তেজনার মধ্যে আমরা ম্যাচ জিতি।"

বোম্বাইয়ের ৫১৭ রানের বড় ইনিংস গড়ায় অশোক মাঁকড়ের প্রধান সহযোগী ছিলেন তরুণ গুলাম পারকার। ওঁরা দু'জনে ৩১৮ মিনিটে ২৯৭ রান যোগ করেছেন। গত ২৩ বছরে তৃতীয় উইকেটের জুড়িতে এত রান কেউ করেননি। গুলামের নিজস্ব অবদান ১২১, এবং এবারের রণজি ট্রফিতে পরপর তিনটি ম্যাচে উনি সেনচুরি করলেন। শুরুতে মনে হয়েছিল গুলাম এই ম্যাচে তেমন সুবিধা করতে পারবেন না। দীর্ঘ ৯০ মিনিটে মাত্র চার রান করেন। কিন্তু তারপর তাঁকে আস্থার সঙ্গে ব্যাট করতে দেখা গেল, ক্রীজ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর অন-সাইডে ড্রাইভ এবং সুইপগুলি সত্যি ছিল দেখার মতো। অশোক মাঁকড় গুলাম সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী। উনি বললেন, "গুলাম দারুণ ব্যাট করছে, আর ফিলডিংয়ে তো সারা ভারতে ওর জুড়ি নেই। আমার বিশ্বাস ও শিগ্‌গিরই টেস্ট খেলবে।"

ওয়ানখাড়ে স্টেডিয়ামের ধূসর রঙের পিচের দিকে তাকিয়ে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছিল এই উইকেট ব্যাটসম্যানদের সহায়ক। আর তাই টসে জিতে দিল্লির অধিনায়ক বিষাণ সিং বেদী প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আকাশ ছিল মেঘলা, ফুরফুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল, এবং যে-কোনো উইকেট অন্তত প্রথম ঘণ্টায় পেস বোলারদের বেশ কিছুটা বাড়তি সাহায্য করে থাকে। সুইং বোলিংয়ের আদর্শ পরিবেশকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন

ট্রফি নিয়ে উল্লাস

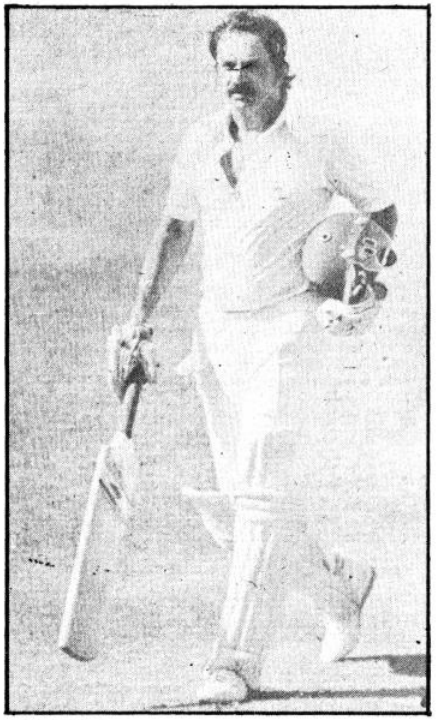

অশোক মাঁকড়

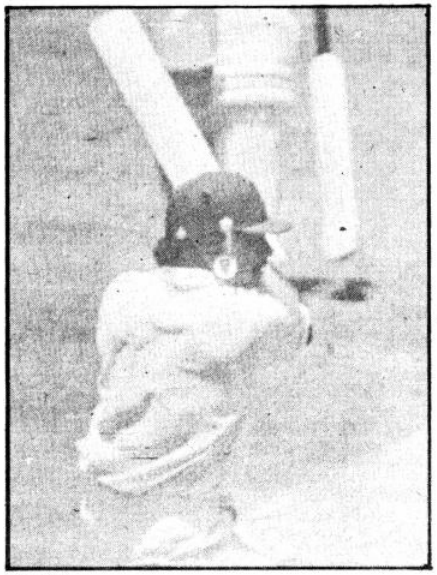

মদনলাল

বোম্বাইয়ের প্রথম শিখ ক্রিকেটার রাষ্ট্রীয় কেমিক্যাল্‌সের কর্মী বলবিন্দর সিং সাঁধু। সুরু নায়েক শূন্য রানে করণ পালকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর মাত্র চার ওভারের মধ্যে সাঁধু রমন লাম্বা, অরুণ লাল, সুরিন্দার খান্না এবং মদনলালকে আউট করলেন। সাঁধুর এই সময়ে বোলিংয়ের হিসেব ছিল ৭-৫-৪-৪।

মাত্র ৩৫ মিনিটের মধ্যে ১৮ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে দিল্লি চরম বিপদে পড়ে। তবু শেষ পর্যন্ত যে তাঁরা কিছুটা ভদ্রগোছের ২৫১ রান করতে পেরেছেন, তার অনেকটা কৃতিত্বই রাকেশ শুক্লার প্রাপ্য।

বোম্বাই প্রথম ইনিংসে ২৬৬ রানে এগিয়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনেই বোঝা গিয়েছিল তারা ম্যাচ জিতছেই। কিন্তু সেটা যে ইনিংস জয় হবে, তা অনেকেই ভাবতে পারেননি—বিশেষ করে যখন মদন ও সুরিন্দার ব্যাট করছিলেন।

৮০ রানের মধ্যে অরুনলাল, লাম্বা, ভালসন এবং তিলকরাজের উইকেট হারানোর পর মদন এবং খান্না পঞ্চম উইকেটের জুড়িতে ১১০ রান যোগ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়ার পর সাঁধু এবং সুরু নায়েক সহজেই দিল্লিকে ঘায়েল করেন। ২২০ রানে সকলে আউট হয়ে যাওয়ায় পাঁচদিনের ম্যাচ চারদিনে শেষ হয় এবং বোম্বাই ইনিংস এবং ৪৬ রানে জেতে। ২০টি উইকেটের মধ্যে বোম্বাইয়ের দুই পেস বোলার নায়েক এবং সাঁধুর সংগ্রহে যথাক্রমে আটটি এবং নয়টি উইকেট। প্রথম ইনিংসে মদনলাল ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ৭৮ একটি অনবদ্য ইনিংস। আর প্রতিকূল পরিবেশে তিনি যেমনভাবে বোম্বাইয়ের আটজন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন, তা বোধহয় একমাত্র মদনের মতো লড়িয়ে ক্রিকেটারের পক্ষেই সম্ভব।

মদন এবং রাকেশ শুক্লা ছাড়া দিল্লির আর যে-খেলোয়াড়টি দর্শকদের মুগ্ধ করেছে, আপাতদৃষ্টিতে সে কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারেনি। তবে তার বোলিংয়ের ধরন-ধারণ এবং চটপটে ফিলডিং দেখে অনেকেই বলাবলি করছিলেন, ১৬ বছরের মনিন্দার সিংয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

ফোটো নিখিল ভট্টাচার্য

কী করে নাগজি ট্রফি পেলাম

সুরজিৎ সেনগুপ্ত

১৬ মার্চে দল বদলের পালা শেষ হলে অনেকেই বসলেন খাতা-কলম নিয়ে। যাঁদের হাতে খাতা-কলম ছিল না, তাঁরা বসলেন চায়ের টেবিলে, পাড়ার রকে, কিংবা স্কুল-কলেজের মাঠে। কোন টীম কেমন—তাই নিয়ে শুরু হল আলোচনা! সাধারণভাবে সকলেই প্রায় একমত হলেন যে বড় তিনটি দলের মধ্যে মোহনবাগান মানে আমাদের দলটিই দুর্বল। সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের দল থেকে কেউ-কেউ চলে যাওয়ার ফলে আমরা প্রথমে বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম। তবে মনমরা হয়ে থাকলে তো আর চলবে না!

সামনেই নাগজি ট্রফির খেলা।

সময় বেশি নেই। দিন-চারেক মোহনবাগান মাঠের সবুজ ঘাসে আমরা একটু নড়াচড়া করে নিলাম। তা তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সে-সময় মাঠে এসেছিলে। অবশেষে সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে কালিকটের উদ্দেশে যাত্রা করলাম আমরা। কিন্তু, শুরুতেই বাধা। একেই তো টীম হিসেবে আমরা দুর্বল, তার ওপর আবার বাড়ি থেকে বেরোলাম ভীষণ দুর্যোগ মাথায় নিয়ে। পরে দেখলাম, দুর্যোগ একেবারেই কেটে গেছে। প্রতিযোগিতার শেষে নাগজি ট্রফিটি মোহনবাগানের হাতেই এল। কলকাতা থেকে একটা মাত্র দল ওখানে গিয়েছিল। সুতরাং তোমরা সবাই চেয়েছিলে, ট্রফি যেন আমরাই জিতি। কিন্তু, সত্যি করে বলো, তোমরা একটু দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলে না? সে যাই হোক না কেন, সকলের আশা পূর্ণ হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

প্রথম খেলাতে নতুন জায়গার সঙ্গে আমরা মানিয়ে নেওয়ার আগেই মফতলাল আমাদের দু-দুটো গোল দিয়ে দিল। প্রথম খেলাতেই হেরে যাব? হতেই পারে না। সব খেলোয়াড় মিলে কোমর বেঁধে লড়ে গেলাম। সুব্রত ভট্টাচার্য যে ডিফেন্স থেকে উঠে এসে দুটো

সুরজিৎ

গৌতম

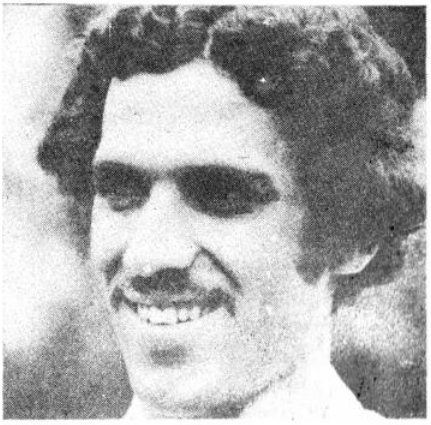

সুব্রত

ছবির মজা

দুটি ছবি কি একইরকম?

(না। ড্রাইভারের টুপির নকশা আলাদা, গাড়ির নম্বর আলাদা, পিছনের একজস্ট পাইপও আলাদা।)

ইংরেজিতে ভাবলে আটটি জিনিসের মধ্যে কোনটির নামের সঙ্গে কোন্‌টির নাম মিলবে?

(বুক হুক, কার স্টার, ওয়েল বেল্, চেয়ার পেয়ার।)

গোলই শোধ করে দেবে কেউ ভাবতে পারেনি।

খেলা ড্র হওয়ায় পরের দিন আবার খেলা। জিততে আমাদের হবেই, কিন্তু ওরা কি ছাড়বার পাত্র! গোল দিল, আমরা আবার এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ওরা শোধ করে দিল। অবশেষে ট্রাই-ব্রেকার।

আমাদের গোলকীপার শিবাজি ব্যানার্জি টাই-ব্রেকারে কখনও হারেনি। পাঁচটা করে পেনালটি কিক মারা হয়ে গেল, কিন্তু তা-ও খেলার মীমাংসা হল না। খেলার নিয়ম অনুসারে আর একটা করে সুযোগ। সাডেন ডেথ বা হঠাৎ মৃত্যুর আশঙ্কা! এতক্ষণ লড়াইয়ের পরে একটা ভুলেই সব শেষ হয়ে যেতে পারে। তা-ই হল। মফতলালের রণজিৎ থাপা গোলের বাইরে দিয়ে শট নিলেন। আমরা আমাদের সুযোগটা কাজে লাগিয়ে দিলাম। এই রণজিৎ থাপাই দুদিন ধরে আমাদের কী যে বেগ দিয়েছে কী বলব!

পরের খেলা জে সি টি-র বিরুদ্ধে। মনে আছে তো ইন্দর সিং-কে? নিশ্চয়ই আছে। জে সি টি-র সঙ্গে ডাবল লেগ সেমিফাইনাল। প্রথম দিন বিশ্বজিতের গোলে আমরা জিতলাম। কিন্তু হলে কী হবে, পরের খেলায় হেরে গেলাম এক গোলে। আবার টাই-ব্রেকার।

কিন্তু আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে, গোলে তো শিবাজি। ফাইনালে ওঠার পরে সবাই ভাবল, এবারও টাই-ব্রেকার হবে না কি? কিন্তু মোহনবাগান দল এবার একটু দুর্বল হলেও বড় দল তো বটেই। সুতরাং কোথায় কী দরকার ঠিক জানা আছে। আমাদের দলের সবচেয়ে ছোট ছেলে বিশ্বজিৎ ফাইনালের সেই মূল্যবান গোলটা আমাদের উপহার দিল। গোল দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই খেলা-শেষের বাঁশি বাজল।

খেলার শেষে কালিকটের দর্শকরা জয়ধ্বনি দিয়ে বলল, যোগ্য দলই ট্রফি জিতেছে। পুরস্কার দেওয়ার সময় ট্রফি জেতার উত্তেজনায় মাইকের কোনো ঘোষণা আমাদের কানে তেমন যাচ্ছিল না। হঠাৎ শুনতে পেলাম, টুর্নামেণ্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন গৌতম সরকার।

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবাকে কেউ বলে পাগল, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চোর, কেউ স্পাই। উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধবের কর্মচারী নয়নকাজলও লোভী। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক আহত, তার জায়গায় যুধিষ্ঠির পড়াচ্ছেন। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখে জর্দার গন্ধ। যুধিষ্ঠিরও জর্দাপান খান। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখায়, সে-ই কি ফেরারি গোবিন্দ মাস্টার? গোপনে তার পরিচয় জানতে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। সকালে তাঁবুতে এসে গবা জানায়, গোবিন্দ মাস্টার খড়ের গাদায় পৌঁছেছে। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" রামু পাখিকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে ঠোঁটের ঠোক্কর খায়। বাবাও তাকে বেত মেরেছেন। দুঃখী রামুকে গবা গল্প শোনায়। কাশিমের চরে হরিহর পাড়ুই কীভাবে খুন হয়েছিল, সেই ভয়ঙ্কর গল্প। তারপর.....

॥১৩॥

রামু সঙ্গে-সঙ্গে গবার হাত ধরে বলে, "না, না, বলো। বলতেই হবে।"

গবা মাথা চুলকে বলে, "আসলে কী জানো, বেশ কিছুদিন আগেকার কথা কিনা, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তার ওপর আমার মাথাটা কাটা গিয়েছিল তো, তাতেও বুদ্ধি একটু ঘুলিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নায় কাশিমের চরে হরিহরের প্রেতাত্মার সঙ্গে আমার প্রেতাত্মার যে-সব কথা হয়েছিল, তার মধ্যে পাখির কথাটা আসেনি। মনে আছে আমরা সেই গলা-কাটনেওলা লোকগুলোর আক্কেল নিয়ে কথা বলছিলাম। হরিহর একবার ভুল করে একটা মশা মারতে গিয়েছিল তাও মনে আছে। হাওয়ার হাত দিয়ে কি আর মশা মারা যায়? দুজনে খুব হেসেছিলাম। কী হয় জানো, মরলে পর আর পুরনো শত্রুতা, রাগ, হিংসে এ-সব থাকে না। বেঁচে থেকে মানুষ যে-সব কাণ্ডমাণ্ড করে সেগুলোকে ভারী ছেলেমানুষি মনে হয় তখন। বাঁচা অবস্থায় তো আমি হরিহরকে কতই না সমঝে চলছিলাম, মরার পর আবার সেই হরিহরের সঙ্গেই চাঁদের আলোয় গলা-ধরাধরি করে বালির ওপর কত ঘুরলাম।"

"পাখির কথাটা তুললে না?"

"ঐ যে বললাম, বাঁচা অবস্থার কৌতূহলগুলো পর্যন্ত মরার সঙ্গে-সঙ্গে মরে যায়।"

"পাখিটা তবে কী জানত?"

"সেটা ভেবে দেখতে হবে!"

"আর হরিহরকে সেদিন খুনই বা করল কারা? তাদের তুমি চেনো?"

"কস্মিনকালে না।"

"মাস্টার গোবিন্দকে তাহলে পুলিস ধরল কেন?"

"এমনি-এমনি ধরেনি। গোবিন্দরও দোষ আছে।"

"কী দোষ?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গবা বলে, "সে আবার আর-এক গল্প।"

"তাহলে গল্পটা বলে ফেল।"

"সেটা একদিন গোবিন্দর কাছেই শুনে নিও। আজ মেলা বকবক করে ফেলেছি।"

"গোবিন্দর কাছে কবে আমাকে নিয়ে যাবে?"

"আমি এখন তার কাছেই যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো। তবে খবদার, ঘুণাক্ষরেও কাউকে বোলো না যেন। জানাজানি হলেই পুলিস গবাকে ধরে নিয়ে গারদে পুরবে।"

শহর ছাড়িয়ে মাইলটাক মেঠোপথে হাঁটলে একটা বেশ সমৃদ্ধ গাঁ। সন্ধের একটু আগে সেই গাঁয়ের এক সম্পন্ন গেরস্তবাড়িতে রামুকে নিয়ে হানা দিল গবা।

গবাকে দেখে বাড়ির সবাই তটস্থ। "আসুন, আসুন, বসতে আজ্ঞা হোক।"

নিকোনো উঠোনে জলচৌকি পেতে দেওয়া হল। ঘটির জলে হাতমুখ ধুয়ে এসে রামু আর গবা পাশাপাশি দুটো জলচৌকিতে বসতে-না-বসতেই দুটো ছোটো ধামায় টাটকা ভাজা মুড়ি, বাতাসা, নারকোল আর দুধ খেতে দেওয়া হল তাদের। সারা দিনে রামুর এই প্রথম সত্যিকারের কিছু খাওয়া। সে যখন হালুম-হুলুম করে খাচ্ছে তখন গবা খুব মুরব্বির চালে গেরস্তকে জিজ্ঞেস করল, "গরু রাখার জন্য যে বোবা কালা লোকটাকে দিয়েছিলাম সে কেমন কাজ-টাজ করছে?"

"আজ্ঞে কাজ ভালই করে। খায়ও কম। কিন্তু লোকটা ভারী রাগী।"

"খুব চোটপাট করে বুঝি?"

গেরস্থ একটু অবাক হয়ে বলে, "বোবা লোক চোটপাট করবে কেমন করে? তা নয়, তবে চোখ দুখান দিয়ে মাঝে-মাঝে এমনভাবে তাকায় যে, পেটের মধ্যে গুড়গুড়ুনি উঠে যায়।"

"তা লোকটা কোথায়?"

"একটু আগে গোরু নিয়ে ফিরল। এখন গোয়ালে সাঁজাল দিচ্ছে। ডাকাচ্ছি।"

গেরস্তর ছেলে গিয়ে রাখালটাকে ডেকে আনল। পরনে আধময়লা হেঁটো ধুতি, গায়ে একটা মোটা কাপড়ের পিরান, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটির দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, তাকালে বুকের মধ্যে একটু ধুকুর-পুকুর হয় বটে।

গবা জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছিস রে?"

লোকটা 'ব ব ওয়াঁ' গোছের কিছু দুর্বোধ শব্দ করল।

গবা মাথা নেড়ে বলে, "বেশ বেশ বেশ। তুই তো আবার কানেও শুনিস না। তবু বলি, এরা ভাল লোক। এদের কাছে ভাল হয়ে থাকবি। চল গবা, একটু এগিয়ে দিবি আমাদের। আঁধার হয়ে এসেছে, লন্ঠনটা নিয়ে সঙ্গে আয়।"

শুনে গেরস্তর ছেলেপুলেরা হৈ হৈ করে উঠল। "এখুনি যাবে কী গবা জ্যাঠা। আমরা যে তোমার সেই মেছো-ভূতের গল্পটার শেষটুকু শুনব বলে কতদিন ধরে হা-পিত্যেশ করছি। সেই যে গো আন্নাপুরের বড় ঝিলে সেবার মাছ ধরতে গিয়ে জলে একটা বড় কড়াই ভাসতে দেখেছিলে! তারপর সেই ভাসন্ত কড়াইটা যেই কাছে এসেছে অমনি সেটাকে ধরতে গিয়ে হাতে গরম ছ্যাঁকা খেলে! তারপর দেখলে, কড়াইটা জলে ভাসছে বটে কিন্তু তাতে গরম তেল ফুটছে। তারপর কী হল?"

গবা উঠে পড়ে বলল, "সে আর একদিন হবে। বাবুর বাড়ির ছেলেকে নিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি না ফিরলে রক্ষে থাকবে না।"

রাখালটা লঠন আর লাঠি হাতে তাদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে এল। মেঠোপথে পা দিয়েই বোবা রাখাল কথা কয়ে উঠল, "গবাদা, ওদিকে কী হচ্ছে?"

"ধুন্ধুমার। পুলিস চারদিকে তোমায় খুঁজছে।"

দৈনন্দিন জীবন ও বিজ্ঞান

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজ্ঞান আজ কত অজানাকে তোমাদের চোখের সামনে মেলে ধরেছে। দেশী বিদেশী পত্রিকা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশন মারফৎ কত নতুন নতুন রহস্যের উদ্ঘাটন হচ্ছে তোমাদের জীবনে। নিত্য নূতন।

কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগেও বিজ্ঞানকে আমরা আমাদের জীবনে কতটুকু প্রয়োগ করছি? বিজ্ঞান তো প্রযুক্তি বিদ্যা? ছোট্ট একটা দৃষ্টান্তই ধর না! এই আমাদের শহর কলকাতা। এখানকার ভয়ংকর ভীড়ের কথা তোমাদের কারো অজানা নয়। তার ওপরে যোগ হয়েছে 'পলিউশন'। নানা রকম জ্বালানী কলকাতার বায়ুকে দূষিত করছে অহরহ। এই দূষণের পিছনেও কিন্তু আমাদের অবৈজ্ঞানিক মনোভাবই প্রকাশ পাচ্ছে। কলকারখানার ধোঁয়া ও নোংরা যেমন বায়ু ও জল দূষিত করছে, তেমনি যানবাহনগুলির পরিত্যক্ত পোড়া তেলের ধোঁয়া এই শহরের বায়ুকে করেছে শ্বাস নেওয়ার অযোগ্য। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জ্বালানী উনুনের ধোঁয়া।

তোমরা সকলেই জান ধোঁয়া মানেই কার্বন—যা আমাদের শরীরের পক্ষে বিষবৎ। এবিষয়ে ভাববার দিন এসেছে। তবে ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে গাছ লাগিয়ে 'পলিউশন'-কে রোধ করার আবেদন অনেককাল থেকেই তোমাদের কাছে আমরা জানিয়ে আসছি। কারণ তোমরা জান যে গাছপালা কার্বনডায়োক্সাইড গ্রহণ করে ও অক্সিজেন ত্যাগ করে। এছাড়া গাছের জন্য আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে ও বৃষ্টিবাদলাও হয়। গাছ মাটির অবক্ষয় দূর করে ও জমির আর্দ্রতা রক্ষা করে।

তোমরা কি ভাবছো এ বিষয়ে?

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ., ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।)

"তাহলে কী কী হবে বলো তো! সারাটা জীবন ফেরারি হয়ে থাকতে হবে নাকি?"

"আরে না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমাদের সার্কাসও শিগগিরই ডেরাডাণ্ডা গুটোবে। আমি কি পেছনে পড়ে থাকব?"

"সার্কাস ছেড়ে থাকতে পারবি না?"

"ওরে বাবা। সার্কাস ছেড়ে থাকলে মরে যাব।"

"আচ্ছা আর কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক তো।"

"এই ছেলেটি কে?"

"এ হচ্ছে রামু। সার্কাসের খেলা শিখতে চায়।"

রামু লণ্ঠনের আলোয় হাঁ করে গোবিন্দকে দেখছিল। মুখে কথা নেই।

গোবিন্দ তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। একটু হেসে বলল, "বাবুদের বাড়ির ছেলে কেন সার্কাসের খেলা শিখবে? আমাদের মতো বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছেলেরাই সার্কাসে নাম লেখায়।"

রামু বলল, "আমি বাড়ি থেকে পালাব।"

"সে কী।"

"আমার লেখাপড়ায় মন নেই। বাড়ির কেউ আমাকে দেখতে পারে না।"

গোবিন্দ বলল, "বটে! তা সার্কাসের কোন্ খেলাটা তোমার সবচেয়ে পছন্দ?"

"তোমার খেলাটা।"

"সাপের খেলা? দূর, ও তো খুব সোজা। সাপুড়েরাও পারে। আমি খেলাটা কেন দেখালাম জানো?"

"কেন?"

"আমার এখনকার অবস্থাটা বোঝাতে। সারাক্ষণ আমাকে একটা বিপদের সাপ তাড়া করছে, আর আমি কেবলই তার কামড় এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। খেলাটা শিখতে হলে শরীরটাকে হালকা রাখতে হবে, চোখ-কানকে আরো সজাগ করতে হবে, হাত-পাকে করতে হবে চটপটে।"

"আমি সব করতে রাজি।"

"ঠিক আছে। আমি দূরের ওই মাঠটাতে রোজ গোরু চরাই। সকালের দিকে তুমি ঐখানে চলে এসো। খেলা শেখাব।"

"সত্যি শেখাবে?"

"সত্যি শেখাব। তবে এখনই বাড়ি থেকে পালিও না। এখন পালালে বিপদে পড়বে।"

"আচ্ছা।"

"আর আমি কোথায় আছি তা কিন্তু কাউকে বলো না।"

"না, কক্ষনো বলব না।"

"শুধু সার্কাসের সামন্ত মশাইকে গিয়ে এক ফাঁকে বোলো, সার্কাস কবে এ-জায়গা ছেড়ে যাবে তা আমি জানতে চেয়েছি।"

"সামন্ত মশাই যদি তোমার ঠিকানা জানতে চান?"

"বোলো, ঠিকানা জানি না। গোবিন্দ আমাদের বাড়িতে এসে বলে গেছে। আর শোনো রামু, তোমাদের বাড়িতে একটা কাকাতুয়া আছে না?"

"হ্যাঁ।"

"সেই কাকাতুয়াটাকে খুব পাহারা দিয়ে রেখো।"

"কেন বলো তো!"

"পাখিটা কিছু কথা জানে।"

"কী কথা?"

"সেটা তোমার এখন জানা ঠিক হবে না।"

(ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস... সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমুলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

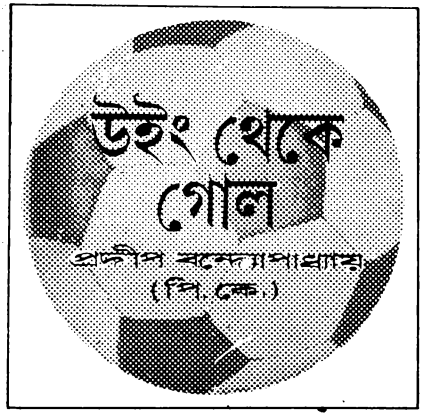

॥ ২০ ॥

কোনো সন্দেহ নেই, রহিম সাহেবই ভারতের প্রথম আধুনিক ফুটবল কোচ। মেলবোর্ন অলিম্পিকের জন্য কলকাতায় ট্রায়াল চলার সময় বাইরের ফুটবলাররা ব্রডওয়ে হোটেলে থাকতেন। সেখানেই থিওরিটিকাল ক্লাস বসত। পেশায় স্কুলমাস্টার রহিম সাহেব কঠিন বিষয়ও সহজ করে বোঝাতে পারতেন। তাঁর সব কথাই আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করতাম। উনি আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন।

আমাদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন মিলিটারি অফিসার পুরণ বাহাদুর। তাঁর স্বভাব ছিল, ঘন-ঘন চোস্ত ইংরেজিতে প্রশ্ন করা। এত বাড়াবাড়ি রহিম সাহেব পছন্দ করতেন না। একদিন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যে পুরণ একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে বসলেন। রহিম সাহেব প্রচণ্ড চটে গিয়ে পুরণকে ক্লাস থেকে বার করে দিলেন। ভেবেছিলাম ঘটনাটা ঐখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সেইদিনই পুরণকে ট্রায়াল ক্যাম্প ছেড়ে চলে যেতে হল। চেহারায় কথাবার্তায় ঝকঝকে পুরণ বাহাদুরের কান্নার কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না। কান্নার আর দোষ কী বলো, বহুদিনের স্বপ্ন একদিনে চুরমার হয়ে গেল। অলিম্পিক খেলার স্বপ্ন সব ভাল ফুটবলারই দেখেন। আর পুরণ যে একজন জাত-ফুটবলার, সে-বিষয়ে রহিম সাহেবের মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না।

কলকাতার ট্রায়ালেও মহম্মদ আলি ছিলেন। সেই মহম্মদ আলি, যিনি কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ভারতের চূড়ান্ত দল থেকে বাদ পড়ার পর মনের দুঃখচেপে রেখে মজার মজার কথা বলেছিলেন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমার একটা মজার ঘটনা ঘটল। প্র্যাকটিস ম্যাচে দুজনেই হেড করতে উঠলাম। দুজনেরই মাথায় খুব লাগল। দুজনেরই মাথায় রক্ত। আমি বললাম, আমার মাথা ফেটেছে। মহম্মদ আলি বললেন, তাঁর মাথা ফেটেছে, দুজনের মাথায় তাঁরই রক্ত লেগে আছে। রহিম সাহেব ছুটে এসে বললেন, "অত কথায় দরকার নেই। দুজনের মাথাই ফেটেছে। দুজনের রক্তই দুজনের মাথায় লেগেছে। তবে বিশেষ কিছু চোট লাগেনি। ওষুধ লাগিয়ে খেলা শুরু করো।"

ট্রায়ালের মাঝপথে কয়েকজন ফুটবলারকে ছাঁটাই করা হল। যাঁরা বাদ গেলেন, তাঁদের নাম শুনলেই বুঝবে, সকলেই নামী ফুটবলার। তবে, রহিম সাহেবের মুখের ওপর কথা বলার সাহস কারো ছিল না। ছাঁটাই হয়ে গেলেন রহমতুল্লা, দামোদরণ, কানন এবং নারায়ণ। একদিন বিকেলে দেখি, কানাইয়ান তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেন গেলেন জানি না। তবে আমি একটু খুশি হলাম। অল্প বয়সের স্বার্থপরতা নিয়ে ভাবলাম, কানাইয়ানও যখন চলে গেলেন, রাইট উইঙ্গার হিসেবে আমার অলিম্পিকে যাওয়া তাহলে কেউ আটকাতে পারবে না। ঘণ্টা তিনেক বাদেই কিন্তু কানাইয়ান জিনিসপত্রসহ হাসিমুখে ফের হোটেলেই ফিরে এলেন। কেন যে তিনি গেলেন, কেনই-বা ফিরে এলেন, বুঝলাম না। তবে স্বীকার করছি, একটু হতাশ হলাম! তারপরেই ভাবলাম, কেন এসব নিয়ে চিন্তা করছি? নিজে ভাল খেলে টীমে আসব। আসবই।

চূড়ান্ত নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এল। তখন নির্বাচক ছিলেন এম দত্তরায়, জিয়াউদ্দিন, জ্যোতিষচন্দ্র গুহ এবং ট্যাগুন। কোচ রহিমও ওঁদের সঙ্গে ছিলেন। বাংলার চার নামী ফুটবলার—সনৎ শেঠ, এস চ্যাটার্জি, সুশীল গুহ এবং চুনী গোস্বামী বাদ পড়লেন।

সনৎ শেঠ বাদ পড়ায় সকলেই অবাক হলেন। কারণ তিনিই তখন ভারতের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক। সনৎদা নিশ্চয় খুব বেশি দুঃখ

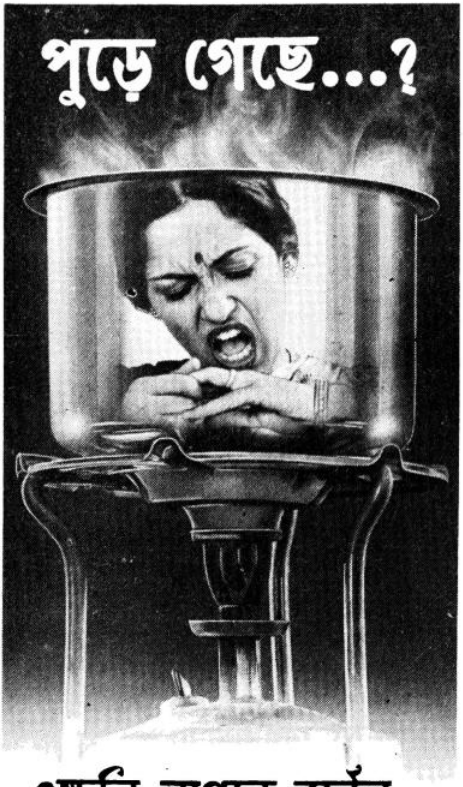

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা !

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল

পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

HTB-BCL-5641

পেয়েছিলেন, তবে আমরাও এজন্য কম দুঃখিত হইনি।

খুব দুঃখ পেলেন চুনী গোস্বামী। অল্পবয়সী চুনীর খেলায় তখন প্রতিভার আগুন। আগের বছর এর্নাকুলামে সন্তোষ ট্রফির আসর মাতিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে চুনী গোস্বামী ভারতের হয়ে কত ম্যাচ খেলেছেন, সাফল্যের সঙ্গে ভারতের অধিনায়কত্বও করেছেন। উনিশশো ছাপান্ন সালের সেই দুঃখই হয়তো চুনীর মনকে শক্ত করে দিয়েছিল। যাঁর প্রতিভা আর সাধনা থাকে, তাঁকে রুখবে কে? আগুনকে কি বেশিক্ষণ ছাই দিয়ে চেপে রাখা যায়?

সনৎদা আর চুনীর জন্য দুঃখ হল ঠিকই, তবে আমার অলিম্পিক খেলার স্বপ্ন সফল হতে যাওয়ায় পাশাপাশি একটা খুশির স্রোতও বইল। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে মনে পড়ল জলপাইগুড়ি ও জামশেদপুরের বন্ধুদের কথা। চোখের সামনে ভেসে উঠল সলিল, যতীন, সুব্রত, অমল, উজ্জ্বল, তারা, সুশীল, ললিত, তাপস, নীলু, টুকু, বোলেন, ঘটক আর বাদলের মুখ। আমার বড় হবার স্বপ্নকে তো ওরাই একদিন উৎসাহ দিয়েছিল। ফুটবল খেলতে শুরু করার পরই স্বপ্ন দেখেছি, একদিন ভারতের হয়ে অলিম্পিকে খেলব। সেই সব স্বপ্নের কথা তো আর বড়দের কাছে বলা যেত না। আমার সৌভাগ্য, বন্ধুরা আমার কথাগুলোকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়নি। ভাবতে ভাল লাগছিল, ওরা যে যেখানেই থাকুক, কালকের খবরের কাগজ পড়ে নিশ্চয় খুশি হবে। আনন্দে ওদের চোখে কি জল এসেছিল? জানি না। আমার তো এল।

মেলবোর্ন যাওয়ার আগে আমরা কলকাতা থেকে বোম্বাই গেলাম। সেখানে আরো পনের দিন প্র্যাকটিস হওয়ার কথা। যাওয়ার পথে ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য জামশেদপুর রেলওয়ে স্টেশনে থামল। বাবা-মা এবং বাড়ির প্রায় সকলেই দেখা করলেন। বাবার কোলে চড়ে একটি শিশু আমাদের টীমের সকলের মুখে মিষ্টি তুলে দিল, ছোট হাত দিয়ে গলায় মালাও পরিয়ে দিল। ভাবলে রূপকথা মনে হয়, সেই শিশুটিই চব্বিশ বছর পরে সিঙ্গাপুরে প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছে। প্রসূন ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর

জামশেদপুর স্টেশনের ঘটনাটাই আমার বার-বার মনে পড়ছিল।

কলকাতাতেই বুঝতে পেরেছিলাম, আমি রহিম সাহেবের নজরে পড়ে গেছি। থিওরিটি-কাল ক্লাস নেওয়ার সময় আমাকে পাশেই রাখতেন। আমার খেলা বোঝার ইচ্ছা দেখে একদিন বলেছিলেন, "একদিন নিশ্চয় তুমি ভাল কোচ হবে।"

বোম্বাই পৌঁছেই হায়দরাবাদ পুলিসের সঙ্গে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে হল। আমি দুটো গোল করলাম। সমর (বদু) ব্যানার্জি আর-এক-গোল দেওয়ায় আমরা তিন গোলে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার মিনিট পাঁচেক আগে হায়দরাবাদের নামী স্টপার সলিম আমার পায়ে প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়লেন। প্রচণ্ড লাগল। কোনোরকমে খেলা শেষ করলাম।

পা ফুলে গেল। কিন্তু ভয়ে রহিম সাহেবকে কিছু বললাম না। যদি টীম থেকে বাদ পড়ে যাই! রুমমেট নিখিল নন্দী অবশ্য বললেন, "ব্যাপারটা রহিম সাহেবকে বলা উচিত।"

পরদিন প্র্যাকটিস কী করে করব? রহিম সাহেবকে বললাম, "আমার শরীর খুব খারাপ, একদিন বিশ্রাম দিলে ভাল হয়।" রহিম

সনৎ শেঠ

চুনী গোস্বামী

সাহেব খেপে গিয়ে বললেন, "এমন করলে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেব।"

কথাটা শুনে দুঃখ পেলাম। প্র্যাকটিসে কোনদিনই ফাঁকি দিইনি। একদিন আমার অসুবিধার কথা উনি বুঝলেন না। বাধ্য হয়ে প্র্যাকটিসে নামলাম। কিন্তু রহিম সাহেবের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। এই বিদ্যাটা এখন আমারও আয়ত্তে এসে গেছে। বুঝতে পারি, সত্যি-সত্যি কার কতটা চোট লেগেছে। কয়েক মিনিট পরেই রহিম সাহেব আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার পায়ে কী হয়েছে?" সব বলে ফেললাম। রহিম সাহেব বললেন, "আগে দেখাওনি কেন?" তারপর পরম যত্নে দু'দিনেই পায়ের আঘাত সারিয়ে তুললেন।

মেলবোর্ন যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। চূড়ান্ত দলে ছিলেন: গোল—থঙ্গরাজ এবং নারায়ণ। ব্যাক—আজিজ, লতিফ, রহমান, সালাম এবং আমেদ হোসেন। হাফ—নুর মহম্মদ, কেম্পিয়া এবং নিখিল নন্দী। ফরোয়ার্ড—পি কে ব্যা-নার্জি, কেষ্ট পাল, সমর ব্যানার্জি (অধিনায়ক), নেভিল ডিসুজা, কিট্টু (সহ-অধিনায়ক), কানাইয়ান, জুলফিকার ও বলরাম। (ক্রমশ)

পুজোর চাঁদা

সমীর সেনগুপ্ত

কাল সরস্বতী-পুজো। তাই বাবাকে বলে রেখেছিলাম আমাদের ক্লাবের পুজোর চাঁদাটা যেন আজই দিয়ে দেন। স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে বেরোচ্ছি, বাবা ডাকলেন, "পাপাই, এই নাও দশ টাকা, তোমাদের পুজোর চাঁদা।"

আমি তাড়াতাড়ি আবার ঘরে ফিরে গিয়ে টাকাটা তাকের ওপর রাখা 'রবিন হুড' বইয়ের ভেতর ঢুকিয়ে আমার চাঁদার হিসেবের খাতায় বাবার নামে দশ টাকা লিখে রাখলাম।

স্কুলে গিয়ে শুনলাম আজ আর পড়াশুনো হবে না, সবাই পুজোর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। বাপ্পা, সুমন, মুন্না, চন্দন—সবার সঙ্গে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সমস্ত চাঁদার হিসেব আমি একটা খাতায় লিখে রেখেছি আর টাকাগুলো সব জমা করা হয়েছে রাজুর কাছে। রাজু আমাদের দলের সবচেয়ে শান্ত ছেলে, এই কিছুদিন হল গ্রাম থেকে এসেছে। ওর বাবা গ্রামে কৃষিকার্য করতেন, তাতে আর চলছিল না বলে পাটনায় এসে তরকারির দোকান করেছেন। বহু কষ্টে ওদের দিন কাটে। তবু টাকাটা আমরা সব রাজুর কাছেই জমা করেছি, কারণ ঠান্ডা মাথায় এ-সব কাজ সে খুব ভাল পারে।

বিকেলে সবাই মাঠে এসে জড়ো হলাম। এখানেই আমরা খেলি আর এর পাশেই মস্ত একটা বাড়ির বারান্দায় প্রতি বছর আমাদের পুজো হয়। এই বাড়ির ছেলে বাবুলও আমাদের সঙ্গে যোগ দিল, যদিও বয়সে সে আমাদের চেয়ে খানিক ছোট। এই হুজুগে আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট ভাই অপু আর তার চেয়েও ছোট বোন রুপুও বেশ দলে ঢুকে পড়ে। তখন আর ছোট-বড় কিছু থাকে না।

আমি আমার চাঁদার খাতা দেখে বললাম, "দুশো বাহান্ন টাকা আমরা তুলেছি এবার, এত কম টাকায় খুব কষ্টে পুজো করতে হবে।"

এবার রাজুর পালা। সে তার টিনের ডিবেটা খুলে সিকি-আধুলি মিলিয়ে যত টাকা আমরা ওর কাছে জমা করেছি সব উপুড় করে ফেলল। সবাই মিলে গোনা শুরু

করলাম। কিন্তু এ কী! বারবার গুনেও দুশো বিয়াল্লিশ টাকার এক পয়সাও বেশি হল না। মুন্না বলল, "দশ টাকা কম কেন?"

আমার হিসেবটা আবার যোগ করলাম। কিন্তু সেটা আবার দুশো বাহান্ন টাকাই হল।

আমি রেগে উঠে বললাম, "রাজু, আমরা সবাই বিশ্বাস করে তোমার কাছে টাকা জমা রেখেছি। তাও ঠাকুরের নামের পয়সা। যেমন করে হোক নিয়ে এসো টাকা, আমরা কোনো অজুহাত শুনব না।"

রাজু মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "তোমরা বিশ্বাস করো, যা তোমরা দিয়েছ, আমি তখুনি এই ডিবেতে সব রেখে দিয়েছি। আমরা গরিব ঠিকই, কিন্তু চোর নই।"

সুমন মুখ বেঁকিয়ে বলল, "হয়েছে হয়েছে, চোর কোথাকার! টাকা আনো, নইলে ভাগো এখান থেকে। খবর্দার, আমাদের সঙ্গে আর থাকবে না তুমি।"

রাজুর চোখে জল এসে গেল। টাকার ডিবেটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে চুপচাপ সেখান থেকে উঠে চলে গেল সে।

বাপ্পা বলল, "ইশ, শেষ পর্যন্ত এরকম চুরি করল রাজু, ছিঃ ছিঃ, ভাবাই যায় না।"

যাক, আমরা পুজোর জিনিসের ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। বিকেলে ঠাকুর নিয়ে এলাম। পরদিন সকালে খুব মজা করে পুজোও হল। সবাই মিলে খুব হৈ-হৈ করলাম। কিন্তু মাঝে-মাঝে দেখতাম, দূরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে রাজু আমাদের পুজো দেখছে। আমার কেমন মায়া লাগত। তাই বলেছিলাম; "ওকে ডেকে নেব নাকি রে? বেচারা...!"

আমার কথা শেষ হবার আগেই চন্দন ভেঙচে উঠেছে, "না-না, বেচারা না আরও কিছু, চোর কোথাকার।"

বিকেলে বিসর্জন হয়ে গেল। পরের দিন থেকে আবার স্কুল। আবার সেই এক-ঘেয়ে জীবন। স্কুল, পড়া, খেলা, আবার পড়া। এদিকে পরীক্ষাও এগিয়ে এল।

হঠাৎ একদিন দেখি তাকের ওপর 'রবিন হুড' বইটা পড়ে রয়েছে। স্কুলে যাবার সময় বইটা উঠিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিলাম, আজ বাবলুকে ফেরত দিয়ে দেব।

টিফিনের সময় মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই গল্প করছি। বাবলুকে ডেকে বললাম, "এই নে তোর বইটা।" বলে ওকে ওর বইটা ফিরিয়ে দিলাম।

চন্দন এগিয়ে এসে আমাকে বলল, "জানিস পাপাই, রাজুরা কাল এখান থেকে চলে গেছে।"

রাজুর কথা আমরা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই সরস্বতী-পুজোর পরে আর রাজু আমাদের কাছে কখনো আসেনি স্কুলে এসেছে কি-না খবরও রাখিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় চলে গেল রে?"

চন্দন বলল, "ওর বাবার দোকান থেকে ধারে তরকারি কিনে-কিনে সবাই কেটে পড়েছে। গাঁয়ের ভালমানুষ লোক, ওদের সঙ্গে পারবে কেন? তাই শেষ পর্যন্ত দোকান তুলে দিয়ে আবার গ্রামে ফিরে গেছে ওরা।"

আমি আবার বললাম, "ওদের গ্রামটা কোথায়, জানিস নাকি?"

চন্দন ঠোঁট উলটে বলল, "কে জানে!"

আর তখনি বাবলু চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী! রবিন হুড বইয়ের মধ্যে দশটা টাকা কোথা থেকে এল?"

আমি ফিসফিস করে বললাম, "সে কী!"

আর সেইসঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল সরস্বতী-পুজোর আগের দিনের ঘটনা। বাবা দশটা টাকা চাঁদা বলে দিলেন, আমি খাতায় সেটা লিখে নিলাম, কিন্তু ভুল করে টাকাটা রবিন হুড বইয়ের মধ্যেই রয়ে গেল, রাজুকে দেবার কথা আর মনে পড়েনি।

টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। সবাই ক্লাসের দিকে ছুটল। মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। হাতে আমার দশ টাকার নোটটা, আর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল। ফিসফিস করে নিজের মনেই বললাম, "রাজু, বিশ্বাস করো ভাই, এ-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আমি করবই।"

ঠিকানা যোগাড় করে এবারে আমাকে রাজুদের গ্রামের দিকে যেতে হবে। যেতেই হবে।

ভুল শুধরে নাও: ৮ এপ্রিলের আনন্দমেলায় 'উইং থেকে গোল' লেখাটিতে একটি ভুল আছে। উত্তরপ্রদেশ বনাম বাংলা দলের সন্তোষ ট্রফির খেলায় বাংলার দেওয়া মোট চার গোলের মধ্যে দুটি গোল করেছিলেন চুনী গোস্বামী; বাকি দুটি গোল সুশান্ত ঘোষের।

ছবি: সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

টাকী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

প্রবীর ঘোষ

উত্তর চব্বিশ-পরগনার বসিরহাট মহকুমার টাকী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়টি ইছামতী নদীর কাছাকাছি টাকী রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের মুখোমুখি অবস্থিত। ১৮৩২ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফের নেতৃত্বাধীনে কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথের প্রচেষ্টায় তাঁদের বিরাট

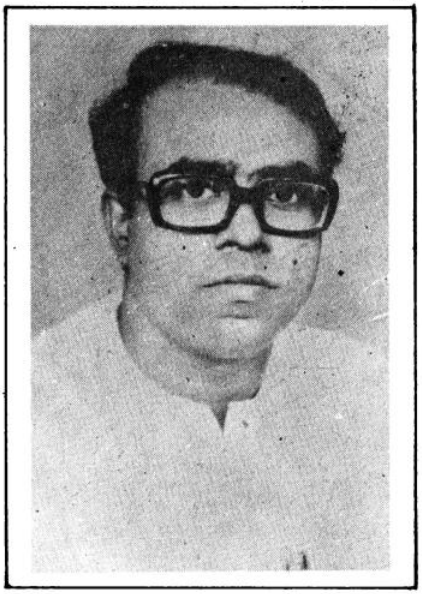

বাড়িতে প্রথম স্কুল খোলা হয় ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, আরবি, ফারসি শেখানোর জন্য। ১৮৫১-তে বাবু রাজমোহন রায়চৌধুরী, বাবু ঈশানচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ শিক্ষানুরাগীরা ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে 'টাকী স্কুল' নাম দিয়ে শুধু ইংরেজির একটি স্কুল খুললেন। ১৮৫৫ সালে যখন গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা প্রচলিত হল, তখন শুরু থেকে 'টাকী স্কুল' মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে সরকারি গ্রাণ্ট পেল। মুখ্যত বাবু রাজমোহন রায়চৌধুরীর চেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮১ সালের ১ এপ্রিল থেকে এই ইংরেজি স্কুলটিতে বাংলা পড়ানোরও ব্যবস্থা করে সরকার এটি অধিগ্রহণ করলেন। বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রগতির পিছনে তৎকালীন রায়সাহেব ফণিভূষণ বসু এবং টাকীর অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে স্থানীয় দুই জমিদার চৌধুরী ও রায়চৌধুরীদের বিশেষ ভূমিকা আছে। শুধু ছেলেদের জন্য এই স্কুলটিতে সকালে প্রাথমিক বিভাগের ক্লাস এবং দুপুরে মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক (ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) বিভাগের ক্লাস চলে। বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৪০০-র মতো। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এটিই সুন্দরবনের দিকের তথা গ্রামবাংলার একমাত্র প্রাচীন সরকারি বিদ্যালয়।

প্রধান-শিক্ষক দুর্গা বর্মন '৭২ সাল থেকে থেকে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। গত বছরই সরাসরি নিয়োগে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে কম-বয়সি এম· এ· বি· এড· এই প্রধান-শিক্ষকের (বয়স ৩৮) ওপর দুই বিভাগেরই দায়িত্ব ন্যস্ত। এই স্কুলের ছাত্ররা একাধিকবার স্ট্যাণ্ড করেছে এবং জাতীয় মেধাবৃত্তি পেয়েছে বহুবার। গতবারের পাশের হার ছিল শতকরা ৯০।

বাংলার এম· এ· প্রধান-শিক্ষক মুখ্যত বাংলাই পড়ান। বাংলায় খুব একটা নম্বর না-ওঠার কারণ কী এবং কীভাবে বেশি নম্বর উঠতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, "বাংলাকে মাতৃভাষা ভেবে অনেকে গুরুত্ব দেয় না। সে-কারণে পড়েও না খুব বেশি। ফলে কোথা থেকে প্রশ্ন এসেছে বুঝতে না পেরে যথাযথ উত্তরও লিখতে পারে না। অনেকে ডট পেনে লেখে বলে হাতের লেখা আরো খারাপ ও অস্পষ্ট হয়। বানান ও গ্রামারের দিকটাও দেখা দরকার। প্রাথমিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের বোঝানোর সুবিধার জন্য বর্তমান সিলেবাসে ছন্দ এবং অলংকার অবশ্য থাকা উচিত ছিল। গোটা সিলেবাসটাই অনেকে জানে না, কিসে কত নম্বর আছে তাও জানা দরকার। গ্রামার, ভাবসম্প্রসারণ, রচনা, বঙ্গানুবাদ এবং মৌখিক পরীক্ষার মিলিত নম্বর প্রায় ১০০। অথচ এ-গুলির প্রতি অনেকেই উদাসীন।'

ইংরেজি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য: "সহজ করে ছোট

বাক্যে ইংরেজি লিখুক। নির্ভুল হলে তো কথাই নেই। গ্রামারে একটু জ্ঞান থাকলে এবং কথাবার্তা ইংরেজিতে বলার কিছুটা অভ্যাস থাকলে, তেমন ভয় লাগবে না। ক্লাসগুলি নিয়মিত করলে যথেষ্ট উপকার হয়।" ভূগোল এবং ইতিহাস প্রসঙ্গে বললেনঃ "ভূগোলের ম্যাপের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে। সম্পর্ক থাকা বিশেষ দরকার। ইতিহাস, ভূগোল মুখস্থর দিকেই বেশি ঝোঁক। অথচ একটু বুঝে নিতে পারলে পড়তে হয় কম, নম্বর ওঠে বেশি। ইতিহাস, ভূগোলের পড়ানো বিষয়ের কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছাত্রছাত্রীদের দেখিয়ে আনলে সুবিধা হয়। তাতে তাদের মনে থাকে অনেক বেশি।"

"সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ কী?"

দুর্গাবাবু জানালেন, "স্কুলের ক্লাসে ঠিকমত উপস্থিত থাকলেই উপকার পাবে। 'পড়া হয়নি কেন?' 'আগের দিন আসিনি স্যার' এই গ্যাপ যত না বাড়ে ততই ভাল। ক্লাসে রাফ-খাতায় মাস্টারমশাইদের বক্তব্যের নোট লেখা উচিত। হোম-টাস্ক যথারীতি দিয়ে যেতে হবে এবং শিক্ষকদের সেটা দেখা দরকার। সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে বেশ ভাল হয়।"

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

১৫ বছর বয়সি পৃথ্বীরাজ দত্ত ক্লাস ওয়ান থেকেই এই স্কুলে পড়ছে। টাকীতে স্কুলের কাছাকাছিই বাড়ি। ক্লাস থ্রি থেকে পৃথ্বীরাজ বরাবরই ক্লাসে প্রথম হয়ে উঠছে। নাইন থেকে টেন-এ উঠেছে সে ৭৪ পারসেন্ট নম্বর পেয়ে।

পৃথ্বীরাজ সকালে ঘন্টা তিনেক পড়ে। তারপর স্কুলে। রাতে চার ঘন্টা পড়াশুনা করে। ছুটির দিনে দুপুরে কিছু সময় পড়ে। গত সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রথম একজন গৃহশিক্ষকের সাহায্য সে পাচ্ছে। বাবা প্রীতিকুমার দত্ত কলকাতার একটা অফিসে কাজ করেন। মা ছায়া দত্ত একটি গার্লস্ হাইস্কুলের শিক্ষিকা। পৃথ্বীরাজ জানাল, 'বাড়ির সবার কাছ থেকেই পড়াশুনায় সাহায্য পাই। তবে প্রেরণা পাই সবচেয়ে বেশি দাদুর কাছ থেকে।'

ফিজিক্যাল সায়েন্সে সর্বাধিক নম্বর ৮৮ পেলেও লাইফ সায়েন্সই পৃথ্বীরাজের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়। একটি বিষয়ের জন্য সাধারণত দুটি করে বই পড়ে। তিনটি বইও পড়ে কোনো কোনো বিষয়ে। ইতিহাসই ওর কাছে কঠিন, পড়তে হয় বেশি। ফর্মুলা-টর্মুলা নেই বলে ইতিহাসের জন্য খাটতে হয় অনেক।

ডাকটিকিট সংগ্রহ পৃথ্বীরাজের একটা হবি। ডিটেকটিভ ও শিকার কাহিনী ছাড়া বিজ্ঞানভিত্তিক

লেখা পড়তে ভালবাসে। জিম করবেট, দানিকেন, আর্থার কোনান ডয়েল ও সত্যজিৎ রায়ের লেখা তাই বেশি পছন্দ। প্রায় সব খেলায় অংশ নিলেও, ফুটবলই ওর প্রিয়।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

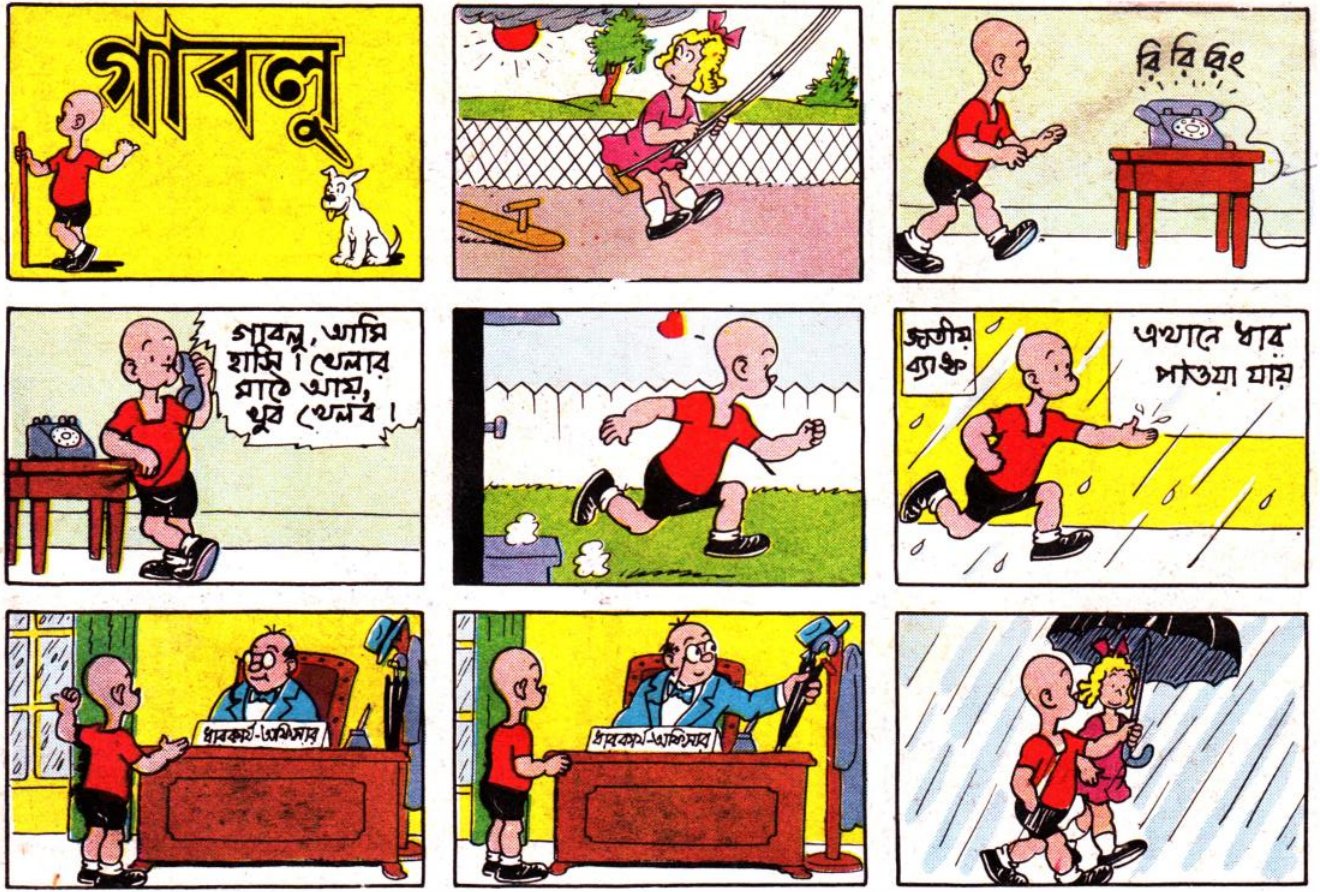

গাবলু
রি রি রিং
গাবলু, আমি হাসি। খেলার মাঠে আয়, খুব খেলব।
জাতীয় ব্যাঙ্ক
এখানে ধার পাওয়া যায়
ধারকর্জ-অফিসার
ধারকর্জ-অফিসার

ভাষা নিয়ে ঠাট্টা নয়

বাচস্পতি

খাওয়াদাওয়ার পর তিন্নির রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হল একটু, তিন্নিও অল্প একটু সময় জুলজুল করে তাকিয়ে শুনল। তারপর চোখ দুটি ঘুমে ঢুলে এল তার। মা তাকে শুইয়ে দিয়ে বাইরে ঘুরে-ফিরে এসে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা লোকদের ভাষা নিয়ে এত ঠাট্টা-ইয়ার্কি করো কেন বলো তো?"

বাবা বললেন, "সত্যি হিগিন, এ খুব অন্যায়।"

হিগিনকাকু ভন্টুর দিকে তাকালেন, ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন, "দেখলি তো, কীরকম উটকো লাঞ্ছনা! শোনো বড়দা, বৌদি শোনো, আমি ভাষাবিজ্ঞানী, কারো ভাষা নিয়ে আমি ঠাট্টা করি না। আমার শাস্ত্র ভাষার সাম্যবাদ মেনে নিয়েছে। আমরা বলি, সব ভাষা সমান, কোনো ভাষা অন্য কোনো ভাষার চেয়ে বড় বা ছোট নয়। যার যা ভাষা, তার সে ভাষাই তার সব দরকার মেটাতে পারে।"

ভন্টুর মা দুষ্টুমি করে বললেন, "বাঃ, তবে আমার ভাষা নিয়ে ভ্যাংচালে যে! আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি সে কি আমার দোষ!"

"মাইন গঠ!"—এবারে জার্মান ভাষায় 'হা ঈশ্বর' বলে উঠলেন হিগিনকাকু। "আরে আমি তো তোমাদের কার কীরকম ভাষা তার নমুনা দিচ্ছিলাম!" তারপর ভন্টুকে বললেন, "মনে রাখবি, যে বৈজ্ঞানিক সে কখনো তার বিষয়কে নিয়ে রসিকতা করে না। ভাষা-বিজ্ঞানীও ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে না। শাস্ত্রে বারণ আছে।"

ভন্টু হতাশ হয়ে বলল, "আমিও পারব না কাকু? ধরো আমাদের ক্লাসের একটি ছেলে কথায়-কথায় স-স-স করে, তাকে সবাই স্যামবাজারের সসিবাবু বলে খ্যাপায়। আমিও তো খ্যাপাই।"

হিগিনকাকু ধমকে বললেন, "ফ্রম নাউ অন, অল খ্যাপানো মাস্ট স্টপ! মনে রাখবে, আজ থেকে তুমি বৈজ্ঞানিক, আর তুমি সাধারণ লোক নও। তোমার কাছে কোনো ভাষা হাসির নয়, লজ্জার নয়।"

বাবা বললেন, "সাধু সাধু! তবে আমরা সাধারণ লোকেরা কিন্তু খ্যাপাব, খেপব। এইমাত্র ভন্টু বলল স-স করে কথা বলার কথা। এর উল্টোও আছে। আমার কলীগ, এই পশ্চিমবঙ্গেরই এক মফস্বল-এলাকার লোক। বড় স্কলার ছিলেন, কিন্তু শ-শ করে কথা বলেন—শিনেমা দেখতে যাবে বাশে করে, না শাইকেলে শিগারেট খেতে-খেতে যাবে?"

হিগিনকাকু অধৈর্য হয়ে বললেন, "আরে ডায়ালেক্ট তো থাকবেই।"

"ডায়ালেক্ট কী কাকু?" ভন্টু এর মধ্যেই জিজ্ঞাসু ছাত্র হয়ে গেছে।

"ওই বাংলায় যাকে বলে উপভাষা। একটা ভাষার নানারকম চেহারা আছে তো। প্রথমে, ধর, জায়গা অনুযায়ী—এক-এক জায়গায় এক-এক চেহারা। নদীয়াতে এই, সিলেটে এই, পুরুলিয়াতে এইরকম, আবার নোয়াখালিতে এইরকম। বলে নোয়াখালির বন্ধুর কাছে শোনা দীর্ঘ বাক্য আউড়ে গেলেন —"ধইন্য খালীচরণ ধইন্য, ধইন্য তোমার অস্ত্রশিক্ষ্যা, ধইন্য মাতৃদুগ্ধ ফান—খোফের ওফর খোফ, খোফের ওফর খোফ, দ্বাবিংশতি খোফে ফাটা (পাঁঠা) না করিল ব্যা!" বলতে বলতেই হাই তুলে "ওফ্, খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে" বলে সোফায় টানটান হয়ে পড়লেন, এবং শুতে-না-শুতেই বিপুল আর্তনাদ করে তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বাবার ইঙ্গিতে ভন্টু একটা বালিশ এনে হিগিনকাকুর মাথার নীচে গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, নাকের ডাক কি একটা ডায়ালেক্ট?"

বাবা নীরব হাসি হেসে বললেন, "কাকু জেগে উঠলে তাঁর কাছেই জেনে নিয়ো সেটা।"

(ক্রমশ)

কত রকমের ভাবনা

প্রসাদ

সেদিন বিছানায় শুয়ে মিলির ঘুম আর কিছুতেই আসে না। রাত্রি দশটা, সাড়ে দশটা, এগারোটা বেজে যায়, ঘুমের দেখা নেই। খালি মনে হচ্ছে কালকের কথা। কাল রাত্তিরে এতক্ষণে কোথা দিয়ে চলেছি, কে জানে!

The train will start at 9:50 in the night.

We shall be at the station at least an hour before the train starts.

Daddy says there will be jams in the streets and we must start early.

The train will not wait for us.

How long will the drive to the station take?

মা তখন কার সঙ্গে যেন টেলিফোনে কথা বলছেন:

Yes, we leave tomorrow.

The train starts at 9:50.

Oh, I don't know, Anjali, but I don't think we get back before the 14th.

মা'র কথা একটু-একটু চম্বলের কানে ভেসে আসছে, আর বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সে ভাবছে:

So, we are leaving tomorrow.

Oh, how I'm going to enjoy the holiday!

We're going to spend two nights in the train.

I'm going to get up very early in the train.

I'm sure Mummy is taking lots of nice things to eat on the journey.

চামেলি ভাবছে:

What will hapen if there's a very bad jam in the street and we can't get to station in time?

What will Daddy do if the taxi breaks down?

What if we start at six o'clock?

Surely we'll get there in time if we start at six.

But suppose there's a very heavy shower and the streets are all under water?

এ-সব কথা ভাবতে মিলির একটুও ভাল লাগল না।

What shall I be doing this time tomorrow?

I shall be sitting by the window and looking out.

Mummy will be asking me to lie down and get some sleep.

But I'll ask Mummy to let me stay awake.

The train will be rushing through the darkness.

The engine-driver will be keeping awake.

So will I.

এ-সবই তো ভবিষ্যতের কথা। লক্ষ করো, কতরকম ভাবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায়। প্রথমত, যা হবেই, যা হওয়া-না-হওয়া কারো ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না:

The train will not wait for us.

It will be Sunday tomorrow.

আবার, যা হওয়া-না-হওয়া কিছুর ওপর নির্ভর করে:

We'll be late if the taxi breaks down.

We'll miss the train if we are late.

আবার, একজনের ইচ্ছের ওপর যখন নির্ভর করে:

Mummy will ask me to lie down.

I'll keep awake.

যে-ব্যাপারটা খানিকক্ষণ চলবে:

I shall be sitting by the window.

The train will be rushing through the darkness.

আবার এ-রকম করেও ভবিষ্যতের কথা বলা যায়:

We are leaving tomorrow.

We leave tomorrow.

বাঘা

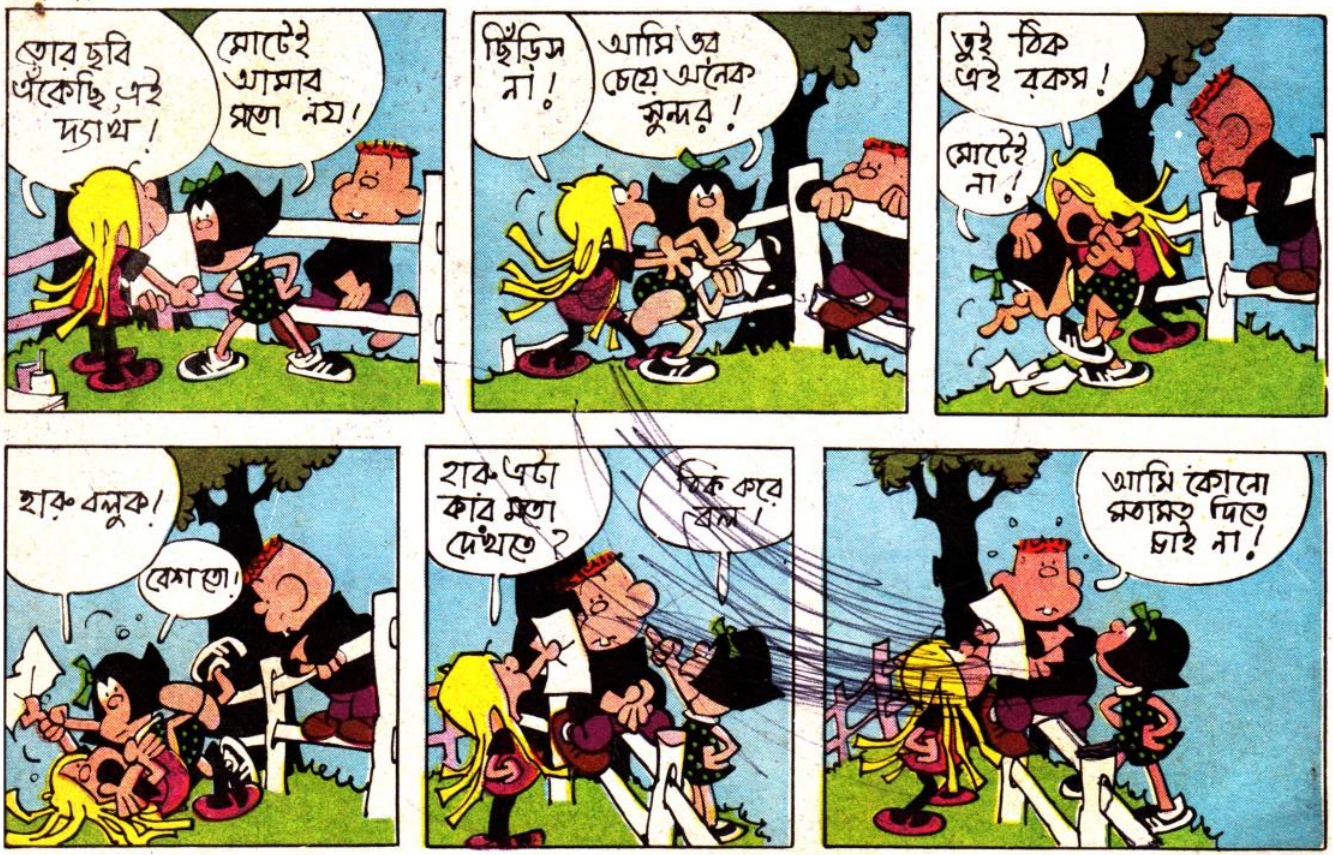

তোর ছবি এঁকেছি, এই দ্যাখ!
মোটেই আমার মতো নয়!
ছিঁড়িস না!
আমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর!
তুই ঠিক এই রকম!
মোটেই না!
হারু বলুক!
বেশ তো!
হারু এটা কার মতো দেখতে?
ঠিক করে বল!
আমি কোনো মতামত দিতে চাই না!

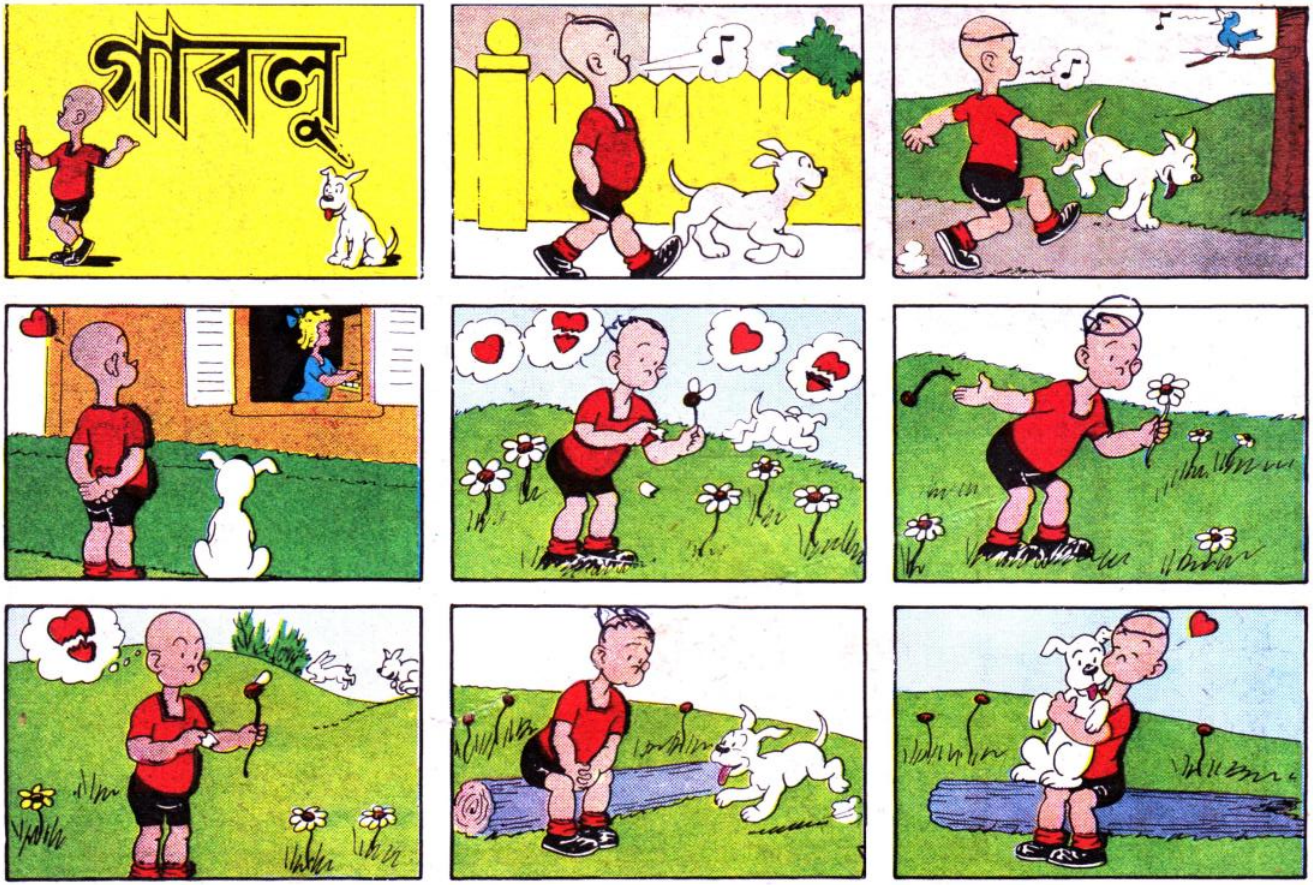
গাবলু

ডিম থেকে পাখি — ৩

এবার আর বসে-থাকা নয়, উড়ে-যাওয়া পাখির একটা ভঙ্গিমাত্র দেখানো হল। নিজেদের দেখা আর আঁচড়ের ভেতর অন্য ভঙ্গি খুঁজে বার করো।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

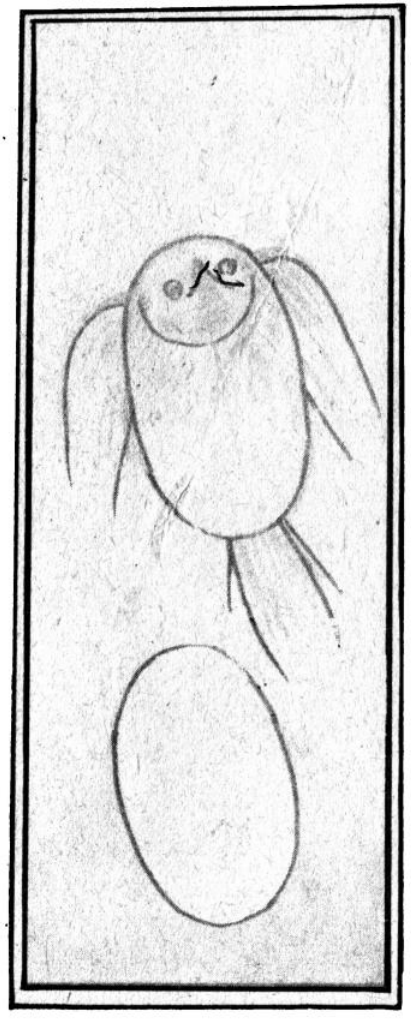

কাগজের ঝোলনা — ৫

প্রত্যেকবার ধাপে-ধাপে কাজের ভেতর তোমার প্রয়োজনমতো পাপড়ি পেয়ে গেছ। এবার নমুনায় লক্ষ করো কেমনভাবে গাঁথতে হয়। প্রথম ঝালরটা গেঁথে নাও সুতোর সঙ্গে—তাতে যেমন গোড়া শক্ত হবে তেমনি কাজের বাহার হবে। এবার একে-একে তোমার তৈরি চার পাপড়ির কাগজ গেঁথে নিতে থাকলেই আসছে-বার সত্যি-সত্যি ঝোলনা কেমন-কেমন দেখতে হবে বুঝতে পারবে।

জেনে রাখো—(১) খুব ভালভাবে মনে রাখবে, একটা ফুল গাঁথার পর দ্বিতীয় ফুল যখন গাঁথবে তার চারটি পাপড়ি যেন প্রথম পাপড়ির ফাঁকে-ফাঁকে পড়ে, আর এইভাবেই পরপর না গাঁথতে পারলে কোনোমতেই মনের মতো আকার পাবে না।

—কারিগর

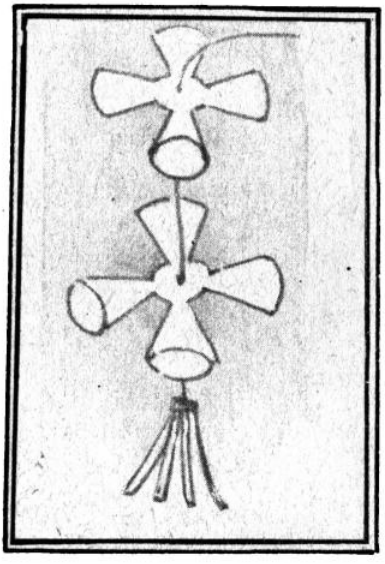

এবার নিন লেবুর স্বাদে

নতুন গ্লুকোভিটা গ্লুকোজ

দ্রুত শক্তি জাগান, চনমনে সতেজতা ফিরে পান!

এবার আপনার প্রিয় গ্লুকোজ পাবেন এক চনমনে নতুন লেবুর স্বাদেও! ভিটামিন ডি আর ক্যালসিয়াম ফসফেট সমৃদ্ধ লেবুর স্বাদে ভরা নতুন গ্লুকোভিটা আপনার ক্লান্তি কাটাবে, আপনাকে তরতাজা রাখবে। আর এর চনমনে স্বাদের তো কোনো তুলনাই নেই···আজই পরখ ক'রে দেখুন না। নিজে খান, অন্যদের খাওয়ান—লেবুর স্বাদে ভরা গ্লুকোভিটা। সতেজতা ও দ্রুত শক্তি ফিরে পান।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্লুকোজ প্রস্তুতকারীর পক্ষ থেকে।

OBM/2951 R-BEN

আপনার চিরপরিচিত গ্লুকোভিটা গ্লুকোজ-ডিও পাওয়া যায়।

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

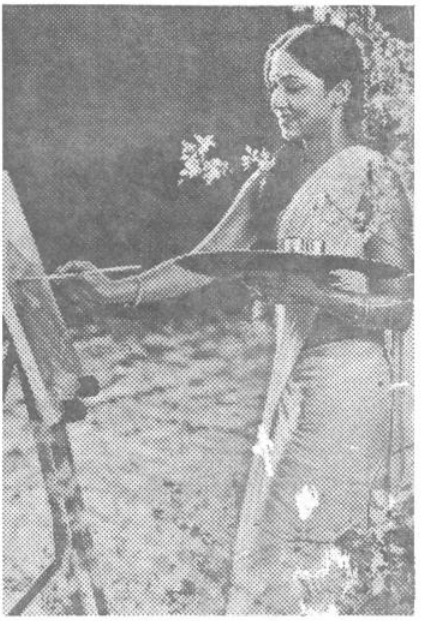

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি··· আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিন্‌টাস-RX.78-2114 B